ফেরিওলা

ও

অন্যান্য গল্প

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

ডি. এম্‌. লাইব্রেরি

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট

কলিকাতা

সূচীপত্র

ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত :

কবিতা

বন্দীর বন্দনা (২য় সংস্করণ)
পৃথিবীর পথে
কঙ্কাবতী
নতুন পাতা

উপন্যাস ও গল্প

সানন্দা
রূপালি পাখি
যবনিকা পতন
বাসর ঘর
যেদিন ফুটলো কমল (২য় সংস্করণ)
বাড়ীবদল
পারিবারিক
পরিক্রমা
ইত্যাদি

প্রবন্ধ ও ভ্রমণ

আমি চঞ্চল হে
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি
সমুদ্রতীর

বুদ্ধদেব বসু প্রণীত ছোটোদের গল্পের বইও অনেকগুলি আছে। সম্পূর্ণ তালিকা ডি. এম. লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।
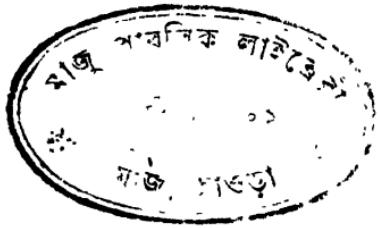
ফেরিওলা

ফেরিওলার হাঁক শুনলেই নীলিমার মন রাস্তায় ছুটে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হয়তো ডাকে—'এই এসো—দোতলায়।' কি হয়তো চাকর দিয়ে ডেকে পাঠায়। পিঠের বোঝা নামিয়ে একটি ঘর্মাক্ত জীব সিঁড়ির ধারে এসে বসে, নীলিমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কত জিনিস যে নেড়ে-চেড়ে ছাখে। চার আনার জিনিস কিনতে আধ ঘণ্টা লাগে। ফেরিওলারা অতি ভালো লোক, অতি মধুর কথা বলে, তাছাড়া তাদের সঙ্গে প্রায় আজগুবি দরদস্তর চলে। আর সত্যি, প্রথমে যা চাইলো তার প্রায় অর্ধেক দামেই হয়তো জিনিসটা দিয়ে যায়। তাও বাকিতে।

কী জিনিস? যেমন ছিটের কাপড়, তাঁতের সাড়ি, কাচের চুড়ি, আর সিঁদুর, আলতা, চুলের কাঁটা, কত কী। আর বাব্লুর জন্যে পুতুল, এটা ওটা। কতগুলো লোক আছে, তারা এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদে চীৎকার ক'রে হেঁকে যায়—'চে-য়াই সাবান তরল আলতা!' পিঠের উপর বোঁচকাটার ভারে শরীরের উপরের অর্ধেক তাদের বাঁকানো—ঐ বোঝা নিয়ে এত বড়ো সহরে কোথা থেকে কোথায় তারা চ'লে যায়, নীলিমার ভাবতে অবাক লাগে।

ফেরিওলা

এদিকে শান্তনু ফেরিওলা পছন্দ করে না। তার বড়োলোকি মেজাজ জিনিসের দরকার হ'লে নিউ মার্কেটে গিয়ে ঝনাৎ-ঝনাৎ টাকা ফেলে নিয়ে এসো—হাঙ্গামা চুকলো। ফেরিওলা, জাপানি খেলো জিনিস এব দরদস্তুর—তিনটার উপরেই তার পরম নাক শিঁটকোনো ভাব।

অথচ ঝনাৎ-ঝনাৎ-এর অভাব প্রায়ই ঘটে; এবং শান্তনুর মতে চললে ভালো জিনিস কেনবার আশায় ব'সে ব'সে অনেক দরকারি জিনিস হয়তে কখনোই কেনা হ'তো না। তাছাড়া, সংসারে কত জিনিস দরকার পুরুষরা তার কী বোঝে!

না বুঝুক, নাক ঢোকানো চাই সবটাতেই। যেমন ধরা যাক্, নীলি সেদিন তার ফেরিওলার কাছ থেকে দশ পয়সা ক'রে আট গজ মার্কি রেখেছে, শান্তনু মুখ বাঁকিয়ে বললে, 'ওগুলো রাখলে কেন?'

নীলিমা হঠাৎ চ'টে গিয়ে বললে, 'রেখেছি তো রেখেছি, তুমি চুপ করো।'

শান্তনু সংক্ষেপে বললে, 'পয়সা নষ্ট।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! এদিকে বালিশের ওয়াড়গুলো সব ছিঁ গেছে, তা নিয়ে প্যানপ্যান করতে তোমাকেই শুনি।'

'ও, এ দিয়ে বালিশের ওয়াড় হবে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এই অভাগিনীর একটা শেমিজ।'

'ঐ মোটা কাপড়ে তোমার শেমিজ! আমাকে যদি বলতে—'

'তোমাকে বললে শেমিজ কিনতে ছুটতে তো হোয়াইটেওয়ে লেডল দোকানে! তোমার বুদ্ধির দৌড় তো ঐ পর্যন্ত। হয়তো আধডজ পিলো-কেস্‌ও আসতো।'

'ভালোই তো। ভালো জিনিস তো ভালোই। তোমার শেমিজে জন্য আমি খুব চমৎকার একটা কাপড় কিনে আনবো, দেখো।'

'থাক, থাক, আমি গরিবমানুষ, আমার ওতেই হবে। তুমি আর তোমার ছেলে যত পারো বাবুগিরি কোরো।'

নীলিমা তক্ষুনি মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে সেলাইয়ের কল নিয়ে ব'সে গেলো। শান্তনু একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে বললে, 'এই খেয়ে উঠলে, এক্ষুনি বসলে কল নিয়ে। ঐ রকম করো বলেই তো মাথা ধরা ছাড়ে না।'

'ওঃ, আমার মাথা—তা ধরলেই বা কী, না ধরলেই বা কী? তোমার মাথা ঠাণ্ডা থাকলেই বাঁচি।' চললো তারপর কলের ঘটরঘটর। শান্তনু আর কী করে, রবিবারের দুপুরবেলায় নভেল হাতে নিয়ে এপাশ-ওপাশ।

দুজনে কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। শান্তনু যা বলবে, নীলিমা ঝাঁ ক'রে প্রতিবাদ করবে; তারপর এক প্রস্থ ঝগড়া। জগতে এমন কোনো বিষয় নেই যাতে দু'জনে একমত!

সকালবেলায় একটা লোক হেঁকে যাচ্ছে—'আতা ফল চাই। আতা ফল!' তক্ষুনি শান্তনু ব'লে উঠলো, 'ঐ যে তোমার কৃষ্ণের বাঁশি।'

নীলিমা বললে, 'ঠিক মনে করিয়েছো। আতা ফলের কথা ক'দিন থেকে ভাবছি। তুমি ভালোবাসো না আতা?

'ও-সব বাজে ফলটল আমি খাইনে।'

'তা খাবে কেন। মনে করো বারো পেয়ালা চা খেলেই খুব হ'লো! রাখি কয়েকটা, আপিস থেকে এসে খাবে।'

আতাওলা এলো, ছটা ফল বেচে দিয়ে গেলো। শান্তনু বললে, 'সত্যি আমার এক-এক সময় ফেরিওলা হতে ইচ্ছে করে।'

'বড়ো সুখ কিনা! এই রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে ক' পয়সাই বা রোজগার। আহা—ওরা বড়ো ভালো। ওদের মধ্যে আমি এ-পর্যন্ত একটাও খারাপ লোক দেখিনি।'

ফেরিওলা

'ওদের স্ত্রীদের মতটা নিশ্চয়ই অন্য রকম।'

'আহা—ওদের আবার স্ত্রী-পুত্র! কোথায় সব দেশে প'ড়ে আছে—বছরে বুঝি দেখাও হয় না।'

শান্তনু একটা চিঠি লিখতে সুরু করেছিলো; অন্যমনস্ক ভাবে বললে, 'হুঁ।'

'তোমার মার্কেটের জোচ্চোরদের পয়সা দেয়ার চাইতে ওদের পয়সা দেয়া ঢের ভালো। ওরা যে কী অসম্ভব গরিব ভাবতে পারো না।'

'কেন বলো তো?'

'সেদিন এক বুড়োর কাছ থেকে চীনে সিঁদুর কিনলুম। ও বলে—এ পাড়ার সকলে আমার কাছ থেকে নেয়, আপনিও নেবেন, মা।'

'ও, তোমার নতুন পুষ্যি হলো বুঝি?'

'ও বলে—আর পারিনে, মা, রোদে-রোদে ঘুরতে, কিন্তু কী করবো। বাবুরা সব বলেন—কত লোক তো সিঁদুর হেঁকে যায় কিন্তু তোমার মতো জোরে আর কেউ হাঁকে না। আমার ডাক শুনলেই বাবুরা চিনতে পারেন। জোরে কি আর সখ ক'রে হাঁকি, মা, জোরে না হাঁকলে কেউ তো ডাকবে না আমাকে। এবারে কিছু পয়সা জমলেই দেশে চ'লে যাবো!—জানো, লোকটা হিন্দুস্থানি, দেশ মজফঃরপুরে, বৌ কবে ম'রে গেছে, এক মেয়ে আছে। বলছিলো, দেশে যাবার টাকা জমতে আরো ছ'মাস নাকি লাগবে। আহা—মেয়ের জন্যে মন কেমন করে না! আমি বলেছি, ওর কাছ থেকেই সব সময় সিঁদুর কিনবো, কিন্তু বছরে মানুষের কতটুকুই বা সিঁদুর লাগে।'

শান্তনু বললে, 'এ-রকম কত আছে।'

'এত খাটে, কিন্তু কী পায়? কিচ্ছু না।'

'আমি যত খাটি, আমিই কি তার উচিত দাম পাই।'

ফেরিওলা

'কী যে বলো! সত্যি, মনটা ভারি কেমন লাগে না? জানো, ও বলছিলো কোনো বাড়িতে কাজ পেলে ফেরি করা ছেড়ে দেয়।'

'তবে আর কী! আমাদের বাড়িতেই ওকে বহাল করো।'

'তা তো আর হয় না। সত্যি-সত্যি কেষ্টটা ভারি ভালো, ওকে কী ক'রে তুলবো? আবার একজন ঝি-ও তো জুটিয়েছো। তিনজন মানুষের জন্য তিনজন লোক রাখবে নাকি? আমি তো আরো ভাবছি সামনের মাসে ঝি তুলে দেব। কিচ্ছু কাজে লাগে না, টাকার শ্রাদ্ধ।'

'তারপর তুমি কোমর টাটিয়ে রোজ ঘরের মেঝে মুছবে তো?'

'ইস্—ঐটুকু কাজ করলে যেন আমি ম'রে যাবো। তোমরা কিচ্ছু বোঝো না। বরং ঝি-চাকরের পিছন-পিছন তাড়না করবার চাইতে নিজের হাতে কাজ করায় অনেক সুখ।'

'বেশ, যা খুসি কোরো', ব'লে শান্তনু চিঠি শেষ ক'রে উঠলো। তার আপিসের বেলা হয়-হয়। আপিসমুখো ট্র্যামে ব'সে-ব'সে শান্তনু ভাবে, সত্যি, আয় বাড়াবার কিছু ব্যবস্থা না করলে চলে না। ভালো লাগে না আর এত টানাটানি। কিন্তু কী করবে? বীমার দালালি? না কি মাসিকপত্রের জন্য গল্প লিখবে?

এদিকে নীলিমার ভাবখানা যেন ভারি নিশ্চিন্ত। পাগল! এই আপিসের খাটনি, তারপর আরো কিছু করতে যাবে নাকি? শরীর ব'লেও একটা জিনিস আছে তো মানুষের! কত টাকাই তো আনছো—আরো লাগবে কিসে? নীলিমা যখন-তখন দু'চার পয়সা থেকে দু'চার টাকা পর্যন্ত বার করতে পারে—বিছানার তলায়, টেবিলের টানায়, সেলাইকলের বাক্সে—যেখানে হাত দেবে সেখানেই কিছু আছে। হঠাৎ কিছু দরকার হ'লে, শান্তনু জানে, নীলিমা চালিয়ে দিতে পারবেই।

কিন্তু একে অবিশ্যি সচ্ছলতা ব'লে ভুল করা যায় না। প্রায়ই বেশ

খোঁচা লাগে। নীলিমা প্রাণপণে হাসিঠাট্টা ক'রে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু শান্তনুর মন-খারাপ হয়ে যায়।

আয় বাড়াবার চেষ্টা তাকে করতেই হবে! সে কি একটা ট্যুশনি পায় না?

সেদিন সন্ধ্যার পর আপিস থেকে ফিরে চা খাচ্ছে, নীলিমা বললে: 'ত্মাখো, সেই সিঁদুরওলা বুড়ো আজ আবার এসেছিলো।'

'বিনা আহ্বানেই?'

'আজ হঠাৎ শুনি ও হাঁকছে—চে-ন্নাই সাবান তরল আলতা, হেজলিন পমেটম পাউডার চাই।' অবিকল ফেরিওলার সুরে ব'লে উঠলো নীলিমা। শান্তনু হেসে ফেললো।

'ও কি রাতারাতি বড়োলোক হ'য়ে গেলো?'

'আমি তো অবাক। ও বললে অনেক কষ্টে এ-সব জিনিস জুটিয়েছে, খালি সিঁদুর বেচে কিছুই হয় না। খুব খুসি লাগলো—এবারে বোধ হয় শিগগিরই ওর দেশে যাবার মতো টাকা জ'মে যাবে—কী বলো?'

'তোমাদের দয়া! তা কত চাঁদা দিলে ওকে?'

'দু' আনা দিয়ে একটা হারমোনিয়ম বাঁশি কিনেছি। বাবলু কী খুসি!'

শান্তনু গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'না কিনলেই কি চলতো না? এমনি ক'রে কত পয়সার অপব্যয় করো।'

'কী যে বলো! ছেলেটা বাঁশি নিয়ে বাজাতে সুরু করেছে, কেড়ে নেয়া যায় নাকি ওর হাত থেকে!'

'এ নিয়ে তো বোধ হয় পঞ্চাশটা বাঁশি কিনলে। ছেলেটা দু'দিন লাফালাফি করে, তারপরেই হয় ভাঙে নয় ফেলে দেয়। এত পয়সা জোটাতে কি আমরা পারি!'

'কী আর করবে, শিশুরা ঐ রকমই। তা দু'আনার বাঁশি কবে আর কিনেছি। এক পয়সার বাঁশের বাঁশিগুলো—'

'এক পয়সা এক পয়সা ক'রে কম হয় না।'

'ওঃ, খুব তো হিসেব শিখেছ। কবে এত সুবুদ্ধি হ'লো? বড়ো যে বলছো অপব্যয়, ফেরিওলাদের কাছ থেকে কত শস্তায় সব পাওয়া যায় তা জানো?'

'শস্তাও যেমন, পচাও তেমন।'

'তা তো ঠিকই! সেদিন দেড়টাকা দিয়ে বাক্সওলার কাছ থেকে বাবলুর যে-কোটটা রেখেছি, সাধ্য ছিলো তোমার চার টাকার কমে কোথাও কেনো! আসল সাটিন, আর কি সুন্দর ছাঁটকাট। তোমাকে পাঁচশো দিন ব'লে ব'লে এই জামাটা কেনাতে পারলুম না। আর্মিনেভিতে যাবার মতো অবস্থা হবে, তবে তো! তাও কত সুবিধে—বাকি রাখা যায়, আস্তে-আস্তে দিতে গায়েই লাগে না।'

শান্তনু সিগারেট ধরিয়ে বললে: 'এদিকে কত পয়সা যে বাজে খরচ হ'য়ে যায় তা তো ভাবোই না। খামকা কত কিছু কেনো—সে-সব কোনো কাজেই লাগে না।'

'কাজে কোনটা লাগে আর না লাগে তুমি তার কী জানো! হাজার রকম ছোটোখাটো জিনিসের ব্যবহারের ফল হচ্ছে—তোমার শারীরিক আরাম। সেই জিনিসগুলো তুমি তো আর চোখে ছাখো না—'

'যথা—হাতা, খুন্তি, শিল নোড়া ইত্যাদি। হার মানছি, এবারে একটা পান দিলে বড়ো বাধিত হবো।'

'এই তো—সেবারে পুরী থেকে ফেরবার সময় কটক স্টেশনে একখানি জাঁতি কিনেছিলাম ব'লে রাগ করেছিলে। অথচ কী সুন্দর জাঁতিখানা, কী চমৎকার কাজে লাগছে!'

ফেরিওলা

নীলিমা উঠে গিয়ে পান সেজে নিয়ে এলো। একটু পরে বললে, 'জানো, ঐ বুড়ো ফেরিওলা বলে কী। ও আমাদের সমস্ত জিনিস দেবে—সাবান, পাউডর, এমন কি তোমার সিগারেট, তারপর মাসের শেষে দাম নেবে। আমরা যে-সব সাবান টাবান মাখি তার বাক্সগুলো পেলে ও ঠিক সেই জিনিস এনে দেবে। তোমার সিগারেটের একটা খালি টিন নিয়ে গেছে।'

মাস ভ'রে বাকিতে সিগারেট খাবার সম্ভাবনায় শান্তনু একটু উল্লসিত হয়ে বললে: 'বলো কী!'

নীলিমা বললে, 'তুমি যদি বলো ওকে ঠিক করি। বাবাঃ, তোমার ঐ নবকৃষ্ণ ভাণ্ডার যা চোর! বাকিতে যেমন দেয়, দাম নেয় ডবল। ওদের তুমি এ মাস থেকে ছেড়ে দাও।'

'বেশ। তোমার ফেরিওলা দিয়ে সুবিধে হ'লেই হয়।'

'ও দিতে পারলে দিক্ না। কী বলো?'

'ভালোই তো। আমার সিগারেট কবে আনবে?'

'বলেছে তো কাল নিয়ে আসবে।'

আর সত্যি, পরের দিন শান্তনু আপিস থেকে ফিরে ছাখে, টেবিলের উপর আস্ত দু'টিন সিগারেট, আর তার সঙ্গে কয়েকটা ছবি আঁকা জাপানি অ্যাশট্রে। একটা বড়ো থালার উপর চারটে ছোটো ছোটো বাটি। নেহাৎ মন্দ না।

'কত দাম নিলে?'

'পাঁচ আনা বলেছে—এখনো দিইনি। সুন্দর, না? তোমার পছন্দ হয়েছে? আর শস্তাও।'

শান্তনু বললে, 'হুঁ।'

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে বললে,

'তোমার পছন্দ না হয় ফিরিয়ে দেবো। অ্যাশট্রে তো তোমার দরকার।'

সত্যি বলতে, ছেলের জন্য এক পয়সার বাঁশি যতটা বাজে খরচ মনে হয়েছিলো, শান্তনুর নিজের জন্য এই অ্যাশট্রে ঠিক ততটা মনে হ'লো না। দোমনা ভাবে বললে, 'আচ্ছা, রেখেছো যখন—'

নীলিমা মুচকি হেসে বললে, 'তোমাকে দাম দিতে হবে না। আমি উপহার দিলুম তোমাকে ওটা।'

'ওঃ, এতই যখন তোমার দয়া, তখন দুটো টাকা আমাকে ধারও দিতে পারো। বড়ো উপকার হয়।'

'আমি গরিব মানুষ, দু'টাকা কোথায় পাবো। দু'আনা চার আনা পর্যন্ত দৌড়।'

'কেন, সেবার তো আস্ত দুটো টাকা দিয়েছিলে।'

'মনে আছে তাহ'লে! দু'দিনের কথা ব'লে দুটো টাকা নিয়েছিলে, আর ফিরিয়ে দিলে না! চোর!'

শান্তনু হেসে বললে, 'গোড়া থেকেই তা-ই। তোমাকে যখন মাতৃক্রোড় থেকে ছিনিয়ে আনলুম তখন ডাকাত বলতে পারতে।'

নীলিমা বললে, 'ওগো ভালোমানুষ, দয়া ক'রে আমার টাকা দুটো ফিরিয়ে দিতে ভুলো না। আমার কৌটোতে কিছু নেই।'

একটি পাউডরের কৌটো ফুটো ক'রে নিয়ে নীলিমা তাতে বাজার ফেরৎ দু'চার পয়সা ফেলে রাখে, মাঝে মাঝে একটা দু'আনি কি সিকি, কদাচ একটা আধুলি কি টাকা। জিনিসটা এক-এক সময় ওজনে খুব ভারি হ'য়ে ওঠে, কিন্তু তার আসল ভার বিশেষ কিছু নয়, কেননা তার গহ্বরে বেশির ভাগই তাম্রমুদ্রা। তবু সেটা অনেক সঙ্কট থেকে বাঁচায় এবং সঙ্কট প্রায়ই ঘটে ব'লে তার উপর এত বেশি টানা-হেঁচড়া চলে যেটা

নীলিমার পছন্দ হয় না। সকালে উঠে দেখা গেলো বাজারের পয়সা নেই, ভৃত্য অপেক্ষমান; নীলিমা আড়ালে গিয়ে কৌটোটা ঝেঁকে-ঝেঁকে পয়সা বার ক'রে—ভৃত্য কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু ঝনঝন শব্দ শোনে কিনা কে জানে। পাউডরের তলানিতে শাদাটে হয়ে যাওয়া এক মুঠো তামার পয়সা চাকরের হাতে দিতেও কেমন লাগে।

কিম্বা হয়তো বাড়িতে হঠাৎ কোনো আত্মীয়রা বেড়াতে এসেছেন, নীলিমা তাঁদের বসবার ঘরে বসিয়ে লুকিয়ে একটি আধুলি উদ্ধার ক'রে আনে, মিষ্টিমুখে ভদ্রতা রক্ষা হয়।

একদা সেই কৌটা থেকে ছ' ছুটো টাকা ধার ক'রে শান্তনু আর ফিরিয়ে দেয়নি। নীলিমা সুযোগ পেলেই সেটা শোনায়।

শান্তনু তার শেষ কথা বললে, 'আমি তো তোমার কৌটোর ভরসাতেই আছি—আর সম্প্রতি তোমার ফেরিওলার।'

ঘরে ব'সে ধারে সিগারেট খেয়ে শান্তনুর মেজাজটা বেশ ভালোই যাচ্ছিলো, এর মধ্যে এক কাণ্ড। সকালবেলায় চা খেয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসেছে; এক বন্ধু বলেছে আধুনিক মেয়েদের বিরুদ্ধে ছ' পৃষ্ঠায় সাধুভাষায় কিছু অসাধু বচন ঝাড়তে পারলে দশটা টাকা পাওয়া যাবে। বিষয়টা মোটেই মনঃপূত নয়, কিন্তু দশটা টাকাও ছাড়া যায় না। কিছুতেই লেখা এগোচ্ছে না, সিগারেটের পর সিগারেট খামকা পুড়ে যায়, এদিকে ঘরের বাইরে নীলিমা অবিশ্রান্ত কার সঙ্গে যেন বকরবকর করছে।

খানিক পরে তার মনে হ'লো এ কোনো ফেরিওলা না হ'য়ে যায় না। রাগে তার মুখ কালো হ'য়ে গেলো। কার সাধ্য এ-বাড়িতে একটু নিরিবিলি ব'সে কাজ করে! সব সময় বাজার বসেছে। এদিকে সে দশটা টাকার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছে, ওদিকে নীলিমার কাণ্ডটা ছাখো।

ঠিক আধুনিক মেয়েদের মারাত্মক আক্রমণ করবার মতোই যখন তার

মনের অবস্থা এমন সময় নীলিমা ঘরে ঢুকে নিচু গলায় বললে—'শোনো, ঐ ফেরিওলা যে টাকা চাইছে।'

'আমাকে কেন বলতে এসেছো ও-কথা', ব'লে উঠলো শান্তনু।

'কাকে বলবো তবে? শোনো, ও বলছে, এত জিনিস দিয়ে ও আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না,—টাকা না পেলেই ওর চলবে না।'

'তাই ব'লে এক্ষুনি চাই? এই মুহূর্তে?'

'বড্ড পেড়াপেড়ি করছে। গরিব মানুষ, ঠিকই তো, এত সিগারেট ও কোত্থেকেই বা দেবে। সব শুদ্ধ ছ' টাকা তেরো আনা হয়েছে।'

'এখন মাসের শেষ, কোথায় পাবো টাকা?'

'তাই তো ভাবছি।'

'আগে ভাবলেই ভালো করতে। যত রাস্তার লোক ধ'রে-ধ'রে জোটাবে, কী বোকার মতো কাজ করো এক-এক সময়।'

শেষের কথাটা হজম ক'রে, অতি নিচু গলায় বললে নীলিমা, 'কাল আসতে বলবো ওকে? পারবে জোগাড করতে?'

কাগজের উপর গোটা দুই লাইনের আঁকিবুঁকির দিকে তাকিয়ে শান্তনুর শরীরটা যেন জ্ব'লে গেলো। চড়া গলায় বলে উঠলো, 'কোত্থেকে জোগাড় করবো? তুমি জানো না আমার অবস্থা? এখন আমাকে ধার করতে ছুটতে হবে তো—আর চাওয়ামাত্র ধারই বা কে দেবে আমাকে।'

নীলিমা প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বললে, 'ও তো বলেছিলো মাসের শেষে নেবে, এ-রকম হবে জানলে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ফেরিওলারা তো এ-রকমই। জোচ্চোর, চোর, বাড়ির মেয়েদের ঠকিয়ে দু'পয়সা করাই তো ওদের পেশা। আর তুমিও যেমন! ফেরিওলা ডাকা ছাড়া আর কি সময় কাটাবার উপায় নেই?'

'দরকারেই ডাকি।'

'অদরকারেও ডাকো। জানো কিছু নেবে না, হাতে পয়সা নেই, তবু কত লোককে ডেকে এক ঘণ্টা জিনিসপত্র ঘেঁটে ফিরিয়ে দাও। লজ্জাও করে না! আমি তোমাকে বলছি, কক্ষনো আর এ বাড়িতে ফেরিওলা ডাকতে পারবে না।'

মুহূর্তে ঝলসে উঠলো নীলিমার চোখ। 'বেশ, আর ডাকবো না। এ বাড়ি তোমার, তোমার ইচ্ছেমতোই সব হবে। কিন্তু এটা ঠিক জেনো যত জিনিস আমি ওদের থেকে কিনি সবই তোমার আর তোমার ছেলের জন্যে। আমার জন্যে? নেহাৎ যা না হ'লেই নয়। এই ছ' টাকা তেরো আনার মধ্যে পাঁচ টাকাই তোমার সিগারেটের, মনে রেখো। আর সাবান —তাও তোমার। আর বুঝি কয়েকটা কাচের গেলাস—তাও—'

'থাক, থাক, আর হিসেব শুনতে চাইনে। এক্ষুনি বিদেয় ক'রে আসছি ওকে।' এক ঠেলায় চেয়ারটা সরিয়ে শান্তনু বাইরে গিয়ে দেখে, বুড়োমতো একটা লোক সামনে প্রায় একটি মনোহারি দোকান সাজিয়ে বারান্দায় ব'সে গামছা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে। রাগে শান্তনুর মুখ দিয়ে হিন্দি বেরিয়ে গেলো, 'এই, ভাগো! বাহার যাও! নিকালো! আভি নিকালো।'

শান্তনুর সঙ্গে তার সিগারেট-সরবরাহকারীর প্রথম সাক্ষাৎ হ'লো এইরকম। লোকটা তার কুঁকড়োনো মুখ তুলে অবাক হ'য়ে তাকালো শান্তনুর দিকে।

'ক্যায়া? মালুম নেই হোতা? বাহার যাও জলদি।' ব'লে শান্তনু ওর দু' একটা জিনিস পা দিয়ে ঠেলেও দিলে বুঝি।

লোকটা একটা কথা বললে না; মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে তার সব পসরা কুড়িয়ে নিয়ে বস্তা বাঁধলে, তারপর সেটা ঘাড়ে ক'রে আস্তে-আস্তে নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

শান্তনু ঘরে ফিরে এসে বললে, 'আপদ গেছে। কক্ষনো আর ডেকো না ব'লে দিলাম।'

কথা বলতে গিয়ে নীলিমার ঠোঁট কেঁপে উঠলো, চেষ্টা ক'রে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'খুব তো বীরত্ব ক'রে এলে। তা ওটা আমার উপর করলেই ভালো হ'তো। ও বেচারা তো কোনো দোষ করেনি।'

নিষ্ঠুরতার একটা নেশা আছে, তারই ঝোঁকে শান্তনু ব'লে উঠলো, 'নাও, নাও, রাস্তার লোককে অত দয়া না ক'রে নিজের স্বামীকে একটু-আধটু দয়া করতে শেখো।'

নীলিমার ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো, চোখ ঝকঝক ক'রে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, 'এটাই তো তুমি জানাতে চাও যে তুমি প্রভু, তুমি প্রভু! এ তো কবেই বুঝেছি যে আমি তোমার দাসী ছাড়া কিছু নই—তোমার সব খুঁটিনাটি মরজি মেনে চললে মাঝে-মাঝে পিঠে একটু হাত বুলোতে পারো বটে। আমার নিজের ব'লে কিছু আছে নাকি? আমি তো সেই রকমই চলি—তুমি যা ভালো না বাসো তা না-করাটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বলতে পারবে, আমার নিজের কোনো সখ ব'লে কিছু আছে, নিজের খেয়ালে একটা টাকা কখনো খরচ করেছি! ভিখিরির মতো কুড়িয়ে কাচিয়ে দু'চার পয়সা যা জমাই তাই দিয়ে কখনো কখনো এটা-ওটা কিনি ব'লেই তো তোমার এত রাগ। ঐ বুড়োকে তোমার সিগারেটের জন্যই ঠিক করেছিলুম—সব সময় হাতে পয়সা থাকে না, অসুবিধে হয়—'

'জানি, জানি, আমি সিগারেট খেয়ে পয়সা নষ্ট করি, এ-কথা কত আর শোনাবে! আমার বাবুগিরির মধ্যে তো ঐ সিগারেট! তা তুমি যা-ই বলো, সিগারেট না হ'লে আমার চলবে না। এত খেটে রোজগার করি, এই সামান্য একটা বিলাসিতাও কি আমার থাকা অন্যায়?'

'থাক, থাক, আর বোলো না। তুমি একা থাকলে তো ভালোই থাকতে, আমাকে বিয়ে ক'রে গরিব হয়েছো ও-কথাটা আর নাই শোনালে। আমি এলাম, তারপর বাবলু এলো, কত বাড়লো খরচ, তোমার নিজের সুখ-সুবিধে সব গেলো, সবই তো জানি! কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে? এত কঠিন দুঃখ কেন দিলে আমাকে। তোমার জীবনের সমস্ত জিনিসের মধ্যে নিজেকে প্রাণপণে বিলিয়ে দিয়ে ভাবি, এই তুমি চেয়েছিলে, আমাকে না হ'লে তোমার কিছুতেই চলতো না, চলবেও না। ভুল, ভুল! আমরা মেয়েরা শুধু মনে-মনে খেলাঘর সাজাই, তা ছাড়া আর কী?'

বলতে-বলতে নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এদিকে শান্তনু হঠাৎ লক্ষ্য করলে ঘড়ির কাঁটা ন'টা ধরো-ধরো। পাগলের মতো ছুটে গেলো বাথরুমে, মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে এসে, হাঁকডাকে কেষ্টকে অস্থির ক'রে তুলে, গোগ্রাসে কিছু ভাত গিলে, পাৎলুন আর কোট চাপিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়ে ট্র্যাম ধরলো! নীলিমার সঙ্গে আর একটা কথা বললে না।

বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ে গেলো।

আপিস্ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই শান্তনু পকেট থেকে একটি দশটাকার নোট বার করলে, 'এই নাও, তোমার ফেরিওলার পাওনা চুকিয়ে দিয়ো।' হেসে বললে কথাটা, ঈষৎ ঠাট্টার ঝোঁকে, যেন সকালবেলার ঘটনাটা এই একটুখানি হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চায়।

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। 'তোমার কাছেই রাখো!'

শান্তনু আবার বললে, 'নাও, রাখো।'

নীলিমা নিলে নোটটা, কাপড়ের আলমারির দেরাজে রেখে দিয়ে বললে, 'চা খাবে এসো।'

খাবার টেবিলে বিরাট আয়োজন, নীলিমাই ব'সে ব'সে ও-সব করেছে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিলো শান্তনুর, দ্রুতবেগে খেতে সুরু করলে! একটু পরে বললে, 'তুমি খাচ্ছো না?'

'আমিও খাচ্ছি।'

একটু শিঙাড়া ভেঙে মুখে দিলে নীলিমা, আধ পেয়ালা চা ঢেলে নিলে। হয়তো সে কেঁদেছে, হয়তো দুপুরে সে খেতে ব'সেও কিছু খেতে পারেনি। এদিকে শান্তনু আপিসে পৌঁছিয়েই যা হোক্ ক'রে সেই প্রবন্ধ লিখে বেয়ারার হাতে পাঠিয়ে দশ টাকা আনিয়েছে; লাঞ্চের সময় খুব খিদে পেয়েছিলো, তবু ভালো ক'রে কিছু খায়নি, তাহ'লে নোটটা ভাঙাতে হয়। এমনি করে নোটটি উপার্জন ও রক্ষা ক'রে বাড়ি নিয়ে এসেছে, কিন্তু নীলিমা একবার জিজ্ঞেস করলে না কোথায় পেলে। কথাগুলো সব মনে-মনে সাজানো ছিলো; বলা হ'লো না।

চাপা গুমোট কাটলো রাত্রি, কাটলো তার পরের দিন। আপিস থেকে ফিরে শান্তনু জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার ফেরিওলা এসে টাকা নিয়ে গেছে?'

'না, আসেনি।'

'আসেনি? কাল আসবে দেখো—টাকা যখন পাবে, না এসে যাবে কোথায়?' কিন্তু শান্তনুর মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়লো।

চারদিন কেটে গেলো, বুড়ো এলো না। শান্তনু বললে, 'নীলিমা, কেমন হ'লো? আসে না কেন লোকটা?'

'কী জানি!'

'অসুখ করলো নাকি? তোমার তো আরো সব ফেরিওলা আছে—তাদের দিয়ে একটু খোঁজ করাও না।'

নীলিমা চুপ ক'রে রইলো।

'রাস্তায় ওর ডাক শুনতে পাও না?'

'কই, শুনি না তো।'

'কাল মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা কোরো।'

কিন্তু পরের দিনও সেই বুড়োর চড়া হাঁক শোনা গেলো না একবারও। তার পরের দিন রবিবার। শান্তনু সারা দুপুর ঘুমোতে পারলে না। প্রায়ই উঠে-উঠে বারান্দায় যায়, মনে হয় সেই বুড়োকে বুঝি দেখবে। কিন্তু কোথায়!

এক মাস কেটে গেলো।

'কী আশ্চর্য', শান্তনু হঠাৎ একদিন বললে, 'সেই বুড়ো আর এলোই না।'

'এলো না তো।'

'কী হ'লো ওর বলো তো?' বড়ো ম্লান দেখালো শান্তনুকে, প্রশ্নটা বড়ো অসহায় শোনালো। 'হয়তো দেশে ফিরে গেছে ওর মেয়ের কাছে—কী বলো?'

'হয়তো গেছে।'

হয়তো গেছে। হয়তো গাড়ি চাপা পড়েছে, হয়তো জ্বর হ'য়ে ম'রে গেছে—কিং হয়তো কলকাতারই অন্য-কোনো পাড়ায় ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে পথে-পথে ঘুরে গলা ফাটিয়ে চীনে সিঁদুর হেঁকে বেড়াচ্ছে, দেশে যাবার পয়সা জমতে এখনো ঢের দেরি। কে জানে!

হার

একটু পরে বীরেন তার নিজের জায়গায় এসে বসলো। এর মধ্যেই তার টেবিলে কতগুলো কাগজপত্র দিয়ে গেছে। দুটো চিঠি তার মধ্যে লাল-পেন্সিল-চিহ্নিত ; আজই জবাব চাই।

পাশের টেবিল থেকে প্রমথ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখলেন, বীরেনবাবু ?

—কেমন আবার !

বীরেন টের পেলো কলারের নিচে তার গলাটা ঘামে ভিজে গেছে। রুমালটা এক আঙুলে পেঁচিয়ে সে ঠেলে দিলে গলার মধ্যে ; আঙুলটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ঘাম মুছতে লাগলো।

—ডাক্তার কী বললে ?

—ওষুধ দিলে।

—কী বললে ? প্রমথ আবার জিজ্ঞেস করলে।

—গ্যালপিং থাইসিস।

—হুঁ। ভেবেছিলাম ঐ রকমই কিছু। খুব রক্ত পড়ছে গলা দিয়ে ?

—পড়ছিলো খানিক আগে।

—এখন বন্ধ হ'য়ে গেছে ?

বীরেন জবাব না দিয়ে টেবিলের কাগজগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলো। একটা চিঠি খোলা হয়নি, খাম না-খুলেই দিয়ে গেছে। ডাকবাবুর চুল পাকলো, বুদ্ধি হলো না। কোন ডিপার্টমেণ্টের কে জানে।

কড়া সুরে সে হাঁক দিলে—বেয়ারা।

প্রমথ জিজ্ঞেস করলে, পঞ্চুর তাহ'লে কী হবে ?

—ওকে বাড়ি নিয়ে গেছে।

—ছুটি দেবে তো আপিস ?

—তার জন্যে ভাবতে হবে না। ছুটি ওর এমনিই মঞ্জুর।

কাগজ পেন্সিল নিয়ে বীরেন একটা চিঠির জবাব লিখতে বসলো। চোখ না-তুলেই বুঝতে পারলে বেয়ারা এসে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছে। চোখ না-তুলেই বললে—ডাকবাবুকো দেও।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বেয়ারা বললে—ই আপকো নেই হ্যায় ?

বীরেন খামটার দিকে তাকালো। চিঠিটা তারই নামে।

—পঞ্চুটা তাহ'লে টেঁশলো।

—নিজের কাজ করো, প্রমথ। বক্‌বক্‌ কোরো না। 'ঝাঁটা' থেকে ঐ প্রুফটা এসেছে ?

—পাঠিয়ে দিয়েছি খানিক আগে।

—কী না কপি ছিলো ?

—এলিক্‌জার হাইপার-মণ্ট।

টেলিফোন বাজলো।

—হ্যালো।

—মিস্টর রয় ?

—স্পীকিং।

—আমি ন্যাশনাল পিক্‌চর্স সিণ্ডিকেট থেকে বলছি। আপনাদের কারখানার একটা তু'রীল ছবি তোলবার কথা হচ্ছিলো—

—আপনারা এস্টিমেট পাঠিয়েছেন?

—আজ পাঠানো হচ্ছে। বাঁড়ুয্যে মশাইকে বলবেন একটু—

—আমার কিছু বলবার নেই জানেন তো।

—আমরা খুব কম রেটই দিয়েছি।

—যেখানে উনি সব চেয়ে কম খরচে পাবেন, সেখানেই অর্ডার যাবে। এর উপরে কথা নেই।

—অবিশ্যি উনি জবরদস্তি করলে আমরাও—

—তাই বলুন। তাহ'লে এস্টিমেট থেকে কত বাদ দেবো? আদ্ধেক?

—মেরে-কেটে পঁচিশ পার্সেন্ট। তার কম পোষাবে না। ব্যবসা ক'রেই পেট চালাই, মশাই, ভোজবাজি জানিনে।

—আচ্ছা তাই বলবো কত্তাকে।

—আচ্ছা, নমস্কার।

দেয়াল ঘেঁষে ঘোষ-সাহেবের টেবিল। বিলেত-ফেরৎ, প্রকাণ্ড মোটা, বাড়ির অবস্থা ভালো। মোটারে আসে। ব্লাড-পেশারে ভুগছে কিছুদিন থেকে।

—রয়।

—আজ্ঞে।

—আজ কাজকর্ম কিছু ভালো লাগছে না। শিগগির ছুটি-ছাটা আছে নাকি হে?

—না, ছুটি আর কোথায়? আমরা তো ঘোরতর নাস্তিক—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোনো পরবই মানিনে।

—যা বলেছো! আমাদের ক্যালেণ্ডারে লাল তারিখ নেই। ব্যাঙ্ক-হলিডেগুলোও কালো। তোমাকে তো তবু রবিবারে আসতে হয় না কখনো।

—আসিনি কখনো, আসতে পারবোও না সোজা ব'লে দিয়েছি।

—লকি ডগ!

—শেষের কথাটা ঠিক বলেছেন।

বীরেন মাথা নিচু ক'রে লিখতে লাগলো। একটা চিঠি শেষ ক'রে আর একটা ধরেছে এমন সময় প্রমথ আবার বললে—

—এলিক্জার হাইপার-মণ্ট কেমন ওষুধ?

—তোমার তো জানা উচিত। তুমিই তো তার গুণবর্ণনা করেছো।

—বিজ্ঞাপনে যা বলে তা কি সত্যি?

—তবে কি জেনে-শুনে মিথ্যে কথা লিখেছো?

—আচ্ছা পঙ্কুকে ওই ওষুধ খাওয়ালে হয় না? ও তো শস্তা দামেই কিনতে পাবে। সেরেও তো যেতে পারে—য়্যাঁ?

—বাজে কথা না-ব'লে নিজের কাজ করো।

—ডাক্তার কি ব'লে দিয়েছে ও কিছুতেই বাঁচবে না?

উল্টোদিকের টেবিল থেকে আধাবুড়ো হরিহরবাবু ব'লে উঠলেন—বাঁচা-মরার কথা কি কোনো ডাক্তার বলতে পারে হে? তবে তো ডাক্তারই ভগবান হতো। সেবার আমার মেয়েটার যে টাইফয়েড হ'লো, আগের দিনও ডাক্তার ব'লে গেলো কিছু ভয় নেই, পরের দিনই খতম। ওর মা তো ঐ মড়া বুকে আঁকড়েই প'ড়ে রইলো, কিছুতে ছাড়বে না। সেই তো মরলো, দু'দিন আগে মরলে আমার অতগুলো ধার হ'তো না। সবই ভগবানের হাত। ওহে নবেন্দু, পালিত কোম্পানির ফাইলটা দাও তো। হিসেব মিলিয়েছো? আবার শোনো: সেদিন আমার সম্বন্ধীর কী এক-

ব্যামো হ'লো—সে ভারি শক্ত ব্যামো, আঠারো শো তিরানব্বুই সালে একবার এক সায়েবের হয়েছিলো, তাও যে-সে সায়েবের নয়—লাটসাহেবের এডিকং—ওহে নবেন্দু, এডিকং জিনিসটা কী হে ?

—হবে একটা-কিছু। লাটবেলাটের কাণ্ড তো সোজা নয়। তারপর ?

—হ্যাঁ যা বলছিলাম। একবার শুধু লাটসাহেবের এডিকং-এর হয়েছিলো, তারপরেই আমার সম্বন্ধীর। চারটি মাস ঝাড়া ভুগলো মশাই, একটা কান আর নাকের আদ্ধেকটা পিঁপড়েয় খেয়ে ফেললে। ডাক্তার কবরেজ সব জবাব দিয়ে গেলো।

—তারপর ?

—বললে বিশ্বাস করবে না, নবেন্দু, লোকটা সেরে উঠলো। ও-মানুষ যে বেঁচে উঠতে পারে, তা তো আমরা ভাই ভাবতে পারতুম না। এক ফোঁটা ওষুধ না, কিচ্ছু না, শুয়ে-শুয়ে জল খেয়ে-খেয়েই বেঁচে উঠলো। সবই ভগবানের ইচ্ছা। স্বামী অমৃতানন্দ আছেন এক সিদ্ধপুরুষ, ওদের উপর তাঁর অসীম কৃপা। তিনি কী বললেন জানো ?—বললেন, আমি আগেই জানতুম ও মরবে না।

—সেরে যাবার পরে বললেন তো ?

—আহা, তাতে কী হ'লো ? তিনি আছেন হরিদ্বার, ওকে চোখেও ছাখেননি, কিছুই না, তবু ব'লে তো দিলেন !

—আশ্চর্য তো। আপনার সম্বন্ধীর নাক-কান কি আবার গজিয়েছে ?

—আরে প্রাণে যে বেঁচেছে এই বেশি।

—স্বামীজি পারলেন না কিছু করতে ?

—ইচ্ছে করলে কি আর না পারতেন ! তবে তিনি বললেন এ ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এর অদলবদল করতে গেলে ভগবানের ইচ্ছার অমান্য করা হয়। ব্যাধি জরা তো আমাদের পাপেরই শাস্তি, বুঝলে না ?

—বুঝলুম, ব'লে নবেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে গেলো একটু বিড়ি ফুঁকতে। বড্ড ঘুম পেয়ে যায় এ-সময়টায় রোজ।

আর-একটা চিঠি শেষ ক'রে বীরেন ডাকলে—বেয়ারা! টাইপিস্টবাবু।

ড্রাফ্‌ট্‌ দুটো বেয়ারার হাতে দিয়ে বীরেন চেয়ারের পিঠে একটু হেলান দিলে। মস্ত বড়ো হল-এ যে যার জায়গায় ব'সে কাজ ক'রে যাচ্ছে। কাজ না করুক, কাজ করবার ভাণ করছে। অন্তত ভাণ করবার চেষ্টা যে করছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। একতলায় আরো পঁচিশজন আছে। না, চব্বিশজন। লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছে পঞ্চু, গায়ের জামাটা রক্তে লাল। মুখখানা সুন্দর ছিলো ছোকরার। ও ছিলো স্টোরকীপর। একতলা থেকেও কয়েক সিঁড়ি নেমে ওর গুদোম। জানলা নেই, আলো নেই. হাওয়া নেই। তাছাড়া খাওয়া নেই। সাতাশ টাকা মাইনে। বারো ঘণ্টা কাজ। এবার ওর ছুটি হ'লো। সম্প্রতি যে ক' হাজার লোক বাংলাদেশে বেকার তাদের একজনের একটা চাকরি হবে ওর জায়গায়।

—ক্রিং ক্রিং।

—হ্যালো।

—বীরেনবাবু নাকি?

গলা শুনেই বীরেন চিনলো, খোদ জামাইবাবু। স্বতঃই কিছু মিহি হ'য়ে এলো তার কণ্ঠস্বর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কারখানা থেকে বলছেন?

—হ্যাঁ। ভাই-বি ট্যাবলেটের লেবেল ফুরিয়ে গেছে।

—কাল তো ছাপতে দেয়া হয়েছে দশ হাজার। প্রুফ দেখে দিয়েছি।

—প্রেসে একটা ফোন ক'রে দিন এক্ষুনি। আজকেই চাই। হিমাংশু এখনো কাজকর্ম শিখলে না কিছু। আপনি প্রেসে যাবেন?

—আজ্ঞে?

—আপনাকে প্রেসের ম্যানেজার আর 'জনগণে'র এডিটর ক'রে দিচ্ছি। যাবেন ?

—সে কী কথা ! আমার উপরে এত সব যোগ্য ব্যক্তি থাকতে !

—আচ্ছা, সে-কথা পরে হবে। আপনার সেই রাইট-অপটা সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে।

—আজ্ঞে ?

—ইণ্ডিয়ান গ্লাস কোম্পানির কথাটা একটু বেশি ক'রে লিখতে হবে।

—আচ্ছা।

তারপর টেলিফোন দেশবন্ধু প্রেসে। বড়ো কর্তার ভাই-পো কর্তা সেখানে। 'জনগণ' ব'লে একটা সাপ্তাহিক কাগজ আছে। ভাই-পো হিমাংশু তেমন কাজের লোক নয়, সেইজন্যে কারখানায় তাকে চারশো টাকার পোস্টে বসিয়ে দেবার কথা হচ্ছে। কাজের লোক হ'লেন জামাইবাবু; জাপান থেকে শিশি-বোতল আনিয়ে এত বড়ো একটা ইণ্ডিয়ান গ্লাস কোম্পানি গ'ড়ে তুলেছেন। খাঁটি স্বদেশি প্রতিষ্ঠান। এরিয়ান ড্রগস্ কোম্পানি মিছিমিছি কি আর ওদের কাছ থেকেই সব শিশি-বোতল কেনে !

—ওহে প্রমথ, সেই রাইট-অপটা একবার বা'র করো তো।

প্রমথ একটা ফাইল বা'র ক'রে দিলে। গোটা ছয়েক 'প্রবন্ধ', বীরেনের লেখা। পাতা উল্টিয়ে গেলো। 'কর্মবীর মহেন্দ্রনাথ', 'একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আত্মকথা', (কোন জাতীয়—বীরেন মনে-মনে ভাবলে ? কিন্তু 'জাতীয়' কথাটা থাকতেই হবে, মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যের হুকুম) 'আর্তের সেবা', 'কেন রোগে ভুগবেন ?' 'খাঁটি স্বদেশি', 'বেকার সমস্যা ও এরিয়ান ড্রগস্ কোম্পানি'। শেষেরটি বীরেন একবার প'ড়ে দেখলো। 'এরিয়ান ড্রগস্' দু'হাজার পরিবারকে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে। তাছাড়া

যে-কোনো বেকার যুবক এই কোম্পানির 'প্রতিনিধিত্ব' ক'রে 'ভদ্র ও সৎ' উপায়ে 'জীবনযাত্রা নির্বাহ' করতে পারেন। মেয়েরাও পারেন। অনেকেই করছেন, আপনিও…। মুহূর্তের জন্য বীরেন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো। কারখানায় ও আপিসে সবসুদ্ধ হাজারখানেক লোক কাজ করছে। তার মধ্যে যে-ক'জন 'বস্' স্থানীয় সকলেই বাঁড়ুয্যের আত্মীয়। তাছাড়াও অন্তত পঞ্চাশজন ঐ মহৎ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। কি কারখানায় কি আপিসে, বেশির ভাগের মাইনে পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর। বিলেতি ডিগ্রিওলা ডাক্তারের মাইনে আশি থেকে একশো। ছ'মাস পরেই ছেড়ে যায়, তখন আর-একজন আসে। সকলেই বলে, বীরেনের উপর বাঁড়ুয্যের নাকি নেক-নজর। সে দেড়শো টাকা পায়, কোট-পাৎলুন প'রে আসে।

'পব্লিসিটি অফিসার', বিজ্ঞাপন লেখে সে। তার উপরে ঘোষ। সে ইকনমিক্সে ফর্স্ট ক্লাস এম. এ., বিলেতেও গিয়েছিলো। বাপ নাম-করা অ্যাটর্নি। টেবিলে ব'সে থাকা ছাড়া ঘোষের কোনো কাজ নেই। হয়তো কোনো কাজ পারেও না সে। তবু সে আছে: পাঁচ বছর আগে আড়াইশো পেতো, এখনো আড়াইশো পাচ্ছে। বোধ হয় তার কোনোদিনই আর বাড়বে না। তবে সে আছে কেন? কোথায় পাবে আড়াইশো আজকালকার দিনে, তার উপর বাপের পয়সা আছে, চ'লে যায়। বাঁড়ুয্যে তাকে রেখেছে কেন? বুড়ো হরিহরবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে ছাখো কথাটা। এক চোখ বুঁজে, ঠোঁট বাঁকিয়ে তিনি বলবেন—আছে হে, এর মধ্যে রহস্য আছে। আর-কিছু বলেন না, বলেননি কখনো। তা হরিহরবাবুর রহস্যও কম নয়। এ-কোম্পানি সম্বন্ধে কথাই আছে যে পাঁচ বছর যে টিঁকলো, হয় সে অমানুষ, নয় সে…আর-একটা কথা ভারি বিশ্রী। কিন্তু হরিহরবাবু আছেন কোম্পানির সূত্রপাত থেকে। আঠারো টাকায় ডেস্‌পাচার হ'য়ে

ঢুকেছিলেন, খামের উপর টিকিট মারতে-মারতে এখন পঁয়ষট্টি টাকার হেডক্লর্ক। কুড়ি বছর হ'লো তাঁর। কোন্ না আরো কুড়ি বছর কাজ ক'রে যাবেন! মরবার আগে হয়তো একশো টাকার চোখ-ঝলসানো চুড়োই চোখে দেখে যাবেন, কে জানে।

হরিহরবাবুর রহস্যটা কী? নাকি, হরিহরবাবুরই কোনো রহস্য নেই?

বীরেনের এই দু' বছর কাজ হ'লো। আর কতদিন?

'খাঁটি স্বদেশি' লেখাটা বার ক'রে বীরেন প্রমথকে দিলে।—ইণ্ডিয়ান গ্লাস কোম্পানির কথা আরো ভালো ক'রে লিখতে হবে।

—আর কী লেখবার আছে?

—তা কি আমি ব'লে দেবো? এটুকু মাথা খাটাতে না-পারলে কাজ ছেড়ে দিয়ে মন্নুমেণ্টের তলায় গিয়ে অ্যান্টি-মিনিস্ট্রি মীটিং করো।

বারোটা বাজলো। ঠিক বারোটা থেকে বীরেনের মেজাজ খারাপ হ'তে আরম্ভ করে। বিকেলের দিকে তার অধীনস্থ কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে এলেই বিপদ।

—লিখে দাও, শিশি-বোতলের ব্যবসায় যুগান্তর এনেছে।

—শিশি-বোতলের যুগান্তর কী রকম?

—'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' কি 'জাতীয় সাপ্তাহিক' হ'তে পারলে সবই হয়।

হঠাৎ প্রমথ বললে—পঞ্চুটা তাহ'লে টেঁশলো। দ্বিতীয়বার বললে কথাটা।

—গ্যাখো প্রমথ, ব'সে ব'সে ক্যাঁ-কোঁ করছো কেন? খোঁজ নিয়ে ঠিক তারিখে মড়া পোড়াতে যেয়ো, তবু বুঝবো কিছু করলে।

—আহা, ও যে সেদিন বিয়ে করলে।

—ও বিয়ে করেছিলো? সাতাশটাকা যে মাইনে পায় সে আবার বিয়ে করে কেন?

—করবে না! ভারতবর্ষে ক'টা লোকের মাসে সাতাশ টাকা আয়! সকলেই বিয়ে করছে।

—তা-ও তো বটে। কথাটায় বীরেনের ভারি চমক লাগলো।

—সাতাশ টাকা কম নাকি ভেবেছেন! দু'টাকা ভাড়ায় খোলার ঘরে থাকতো, হেঁটে যাওয়া-আসা করতো। দিব্যি ছিলো বিয়ে ক'রে। একদিন নেমন্তন্নও খেয়েছিলাম ওর বাড়িতে।

—ছাখো প্রমথ, মড়া পোড়াতে যাবে যখন, একটা টেস্টটিউব নিয়ে গিয়ে তাতে ঐ যক্ষ্মার জর্ম খুব ভালো ক'রে ভ'রে এনো। তারপর, সাতাশ টাকায় যে-সব লোক দিব্যি ভালো থাকে, তাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে যদি ঐ একটি জর্ম ঢুকিয়ে দিতে পারো তবে বুঝলুম কিছু করলে। বুঝেছো কথাটা?

প্রমথ বোধ করি কিছুই বুঝলে না। হঠাৎ হরিহরবাবু ব'লে উঠলেন, সবই পূর্বজন্মের ফল, বীরেনবাবু, নয়তো ধনী-দরিদ্রের ভেদ এলো কোত্থেকে জগতে?

এই অকাট্য যুক্তির সামনে প'ড়ে বীরেন চুপ ক'রে রইলো।

—পূর্বজন্মের বহু পুণ্যের ফলে মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যে আজ মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যে হয়েছেন। আমরা ঘোরতর পাপী ব'লে এই অবস্থা। পূর্বজন্ম যে মানেন না—পূর্বজন্ম যদি নাই থাকবে, তবে মানুষ জন্মান্ধ হবে কেন? একই মা-বাপের একটি ছেলে সুশ্রী, আর একটি কুচ্ছিৎ হবে কেন? একজনের বুদ্ধি কম আর একজনের বেশি কেন? আপনারা কি ভগবানের নিয়ম উল্টিয়ে দিতে পারেন? তাছাড়া দেখুন, টাকা-নেই টাকা-নেই ব'লে হাহাকার ক'রে লাভ কী? বড়োলোকরাই কি খুব সুখী? বড়োলোকের ছেলে মরে না? ভগবান যাকে যেভাবে রেখেছেন তা-ই থাকতে হবে—কী বলো হে, নবেন্দু?

নবেন্দু ঘাড় নাড়লো। ঐ পরেশ ছোকরার কাছে একটা সিগারেট চাইবে নাকি? বিড়ি ফুঁকতে আর ভালো লাগে না।

বীরেন এবার গায়ে প'ড়েই বললে—প্রমথ, ও-বেলা একবার যাবে নাকি পঞ্চুকে দেখতে?

—ভাবছি। দেখুন, রোগটা কী বড্ড ছোঁয়াচে?

—বড্ড। গিয়ে কাজ নেই তোমার।

—না, না, যাবো বইকি। কত জর্ম খেয়ে হজম করছি রোজ। আর আমি মরলেই বা কী? হাসপাতাল একটা ফ্রী মড়া পাবে।

বেয়ারা এসে আরো একতাড়া কাগজ রেখে গেলো বীরেনের টেবিলে।

প্রমথ আবার বললে, বৌটার তিনকুলে কেউ নেই। আহা।

—পঞ্চু ম'রে গেলে তুমি ওকে বিয়ে ক'রে ফেলো। বুঝলে? কোরো কিন্তু এটা।

প্রমথ তক্ষুনি মাথা নিচু ক'রে চুপ। তার মনে হ'লো, বীরেনবাবুর কাছে এমন ধমক সে কখনো খায়নি। কিন্তু এতই কি অসম্ভব? বিধবা-বিবাহ তো চলছেই আজকাল। একটি মুখ প্রমথর চোখের সামনে উঠে এলো, মাথার উপর ডুরে শাড়ির লাল পাড়, কপালের উপর কোঁকড়া কয়েকটা চুল, আর তার নিচেই জ্বলজ্বলে সিঁদুরের ফোঁটা। ঐ ডুরে শাড়ির দাম কত? দু' টাকার কম নয় নিশ্চয়ই? বৌকে বড্ড ভালোবাসতো পঞ্চু। ঐ সিঁদুরের ফোঁটা মুছে যাবে। সে কি আবার সিঁদুর পরবে, আবার···? ছি-ছি, সে কী-সব ভাবছে, পঞ্চু তো এখনো বেঁচে। হয়তো না-ও মরতে পারে, কে জানে।

তারপর আধ ঘণ্টা সকলেই কাজে ব্যস্ত।

—রয়।

বীরেন চোখ তুললো।

ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঙ্কৌ কোথায় হে ? চীনে না স্পেনে ?

—চীনে।

—সেখানে শুনলুম দু' হাজার লোক জাপানির বোমায় মরেছে। মেয়ে শিশু সব। জাপানিরা ভারি পাজি তো। খামকা নিরীহ লোকগুলোকে মেরে ফেললে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভারি অন্যায় ওদের।

—স্পেনেও শুনছি কী সব হচ্ছে। নিজেরাই মারামারি ক'রে মরছে ওরা। আশ্চর্য, মারামারি না করলেই তো পারে।

—যা বলেছেন !

—ব্যাপারটা কী জানো, সমস্ত জাতই আজ ধর্মচ্যুত। জাপানিরা যদি প্রভু বুদ্ধের কথা মেনে চলতো, ইওরোপিআনরা যদি প্রকৃত ক্রিস্টিয়ান হ'তো, তবে কি এ-সব হ'তে পারতো জগতে। ভেবে ছাখো কথাটা।

—কথাটা ভাববার মতো বটে।

—আমার মনে হয়, ভারতবর্ষই এখন মুক্তির পথ ব'লে দিতে পারে। তুমি কি ইয়োগ সম্বন্ধে ইণ্টরেস্টেড ?

—সে-রকম তো···

—আমি ও-বিষয়ে কিছু পড়াশুনো করছি। আমার মনে হচ্ছে একমাত্র যোগ দ্বারাই পৃথিবীর অমঙ্গলের সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। ছাখো, এই বিশ্বে দুটো শক্তি কাজ করছে। একটা দেবশক্তি, আর-একটা দানব-শক্তি। এখন দানব-শক্তি প্রবল। কিন্তু দেব-শক্তিকে ঢের বেশি প্রবল ক'রে তুলতে পারলেই দানব-শক্তির হার হবে, তখন আর মারামারি কাটাকাটি কিছু হবে না। এখন কথা হচ্ছে, সেটা কেমন ক'রে হ'তে পারে—

—সকলেই যদি যোগ করে ?

—ঠাট্টা নয় হে, সেটাই একমাত্র উপায়। ব'লে ঘোষ ড্রয়ার টেনে যা বার করলো, বীরেন ভেবেছিলো তা বুঝি যোগ সম্বন্ধে কোনো বই, কিন্তু দেখা গেলো একটা কাগজের পুঁটলিতে ভরা কতগুলো স্যাণ্ডউইচ। নিজে একসঙ্গে দু'খানা মুখে পুরে চিবোতে-চিবোতে ঘোষ বললে—হ্যাভ ওয়ান।

—নো, থ্যাঙ্কস।

—বেশ ভালো। বড্ড খিদে পেয়ে যায়। শুনলুম আপিসে এক-ছোকরার নাকি গ্যালপিং থাইসিস হয়েছে।

—এইমাত্র শুনলেন?

—ও বুঝি গুদোমে ছিলো? বড্ড অন্‌স্যানিটারি কণ্ডিশন্স। বাঁচবে? বীরেন মাথা নাড়লো।

—I call it murder. তুমি কী বলো?

—খুনে কে?

—তা যা-ই বলো, এ-সব কাজ তো তুলে দিতে পারছো না, কারো-না-কারো করতেই হবে। এঞ্জিনও চালাতে হবে, চুল্লিতে কয়লাও ঠেলতে হবে। এখানেও, ছাখো, যোগেরই দরকার। যোগ করলে অসুখ করে না জানো?

ঘোষ আরো দু'খানা স্যাণ্ডউইচ মুখে পুরলেন।

—খাসা স্যাণ্ডউইচ। রয়, একটা খাও না। আমার বেশি খাওয়া উচিত নয়, ব্লড-প্রেশার আছে কিনা। ভাবছি মাছ-মাংস ছেড়ে দেবো শিগগিরই। যোগটা সীরিয়সলি নেবো।

—হ্যাঁ, সেই ভালো। মরা মাংস খেয়ে আর লাভ কী? খেতে হ'লে জ্যান্ত মাংস খাবেন।

—জ্যান্ত মাংস?

—ধরুন আমাদের জামাইবাবুটি। দিব্যি গোলগাল একটি চর্বির পাহাড়। ক' কামড়ে ওকে সাবাড় করতে পারেন? খেতে বেশ হবে, একেবারে পয়লানম্বরি মাংস।

ঘোষ হা-হা শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন।

বড়োকর্ত্তার ঘরে বীরেনের ডাক পড়লো। বীরেন ঢুকতেই—

—রোয়, সেই অ্যান্টি-টিউবরকিউলসিস অ্যাসোসিয়েশনের বক্তৃতাটা?

—আজ্ঞে, আরম্ভ করেছি।

—পাঁচটার সময় টাউন হলে মীটিং। পাঁচটার আগেই তৈরি চাই।

—পাঁচটার আগেই তৈরি হবে।

—পয়েন্টগুলো ঠিক আছে তো? অনেকের ধারণা ভারতবর্ষে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ দারিদ্র্য। সেটা ঠিক নয়। আসল কারণ হচ্ছে দেশের লোকের অজ্ঞতা। ডায়েট সম্বন্ধে ধারণা নেই। রোজ দু' আনা খরচ ক'রে একজন সাবালক বেশ ভালো নিউট্রিশন পেতে পারে, এটা প্রমাণ করা যায়। কী খেতে হবে তা জানা দরকার। হাইজিনের সাধারণ জ্ঞান দরকার। তাহ'লেই—

—তাহ'লেই কেউ আর যক্ষ্মায় মরবে না।

মহেন্দ্র ব্যানার্জি সাধারণত নিম্নস্থদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না; হঠাৎ এক মুহূর্তে তাঁর হলদে-আভা-ওলা চোখ বীরেনের মুখের উপর পড়লো। একটু চুপ থেকে বললেন—হ্যাঁ, তাহ'লেই কেউ আর যক্ষ্মায় মরবে না। এ-কথাই লিখতে হবে। যাও। দুটোর মধ্যেই দরকার।

—দুটোর মধ্যেই?

—দুটোর মধ্যেই। কথা বললে বোঝো না?

—এখনই তো প্রায় একটা—

—তা জানি। যাও, দুটোর আগেই চাই।

লাল-টকটকে মুখ নিয়ে বীরেন বেরিয়ে এলো বড়োকর্তার ঘর থেকে।

অ্যান্টি-টিউবরকিউলসিস অ্যাসোসিয়েশনের বক্তৃতাটা আজ আপিসে এসেই আরম্ভ করেছিলো। কোথায় গেলো সেটা? ড্রয়ার ঘেঁটে টেবিলের কাগজপত্র উল্‌টিয়ে কোথাও সেটা পাওয়া গেলো না। ঘামে বীরেনের শার্টের তলায় গেঞ্জি ভিজে গেলো। একটা বাজলো।

টেবিলের কাগজ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বেরিয়ে পড়লো বন্ধ খামের একটা চিঠি। ও, তার নামের সেই চিঠিটা। ভুলেই গিয়েছিলো। কে জানে কে লিখেছে। নেহাৎ বিরক্তভাবে খামটা খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেললো। ভিতরে টাইপ-করা চিঠি, আর নীল রঙের মোটা একটা কাগজ। কাগজটার ভাঁজ খুলে বীরেন তাকালো, তারপর কয়েক মিনিট তার চোখের সামনা থেকে সমস্ত আপিসঘর, অতগুলো মানুষ, ঘরের দেয়াল, সমস্ত মুছে গেলো। চারদিক ফাঁকা।

তারপর সে তার চেয়ারে ব'সে পড়লো।

আবার যখন সে চোখে দেখতে পেলো, তখন একটা বেজে দশ মিনিট। এতক্ষণে দশ মিনিট মোটে কেটেছে। আর তার মনে হচ্ছিলো কতক্ষণ।

চট ক'রে সে উঠে দাঁড়ালো। চেয়ারের পিঠ থেকে কোটটা তুলে নিয়ে গায়ে দিলে। চিঠিটা খাম-সুদ্ধ ভরলো বুক-পকেটে।

—যাচ্ছেন নাকি কোথাও? প্রমথ জিজ্ঞেস করলে।

—আসছি এক্ষুনি।

একটা বেজে গেছে। বাড়ুয্যে এতক্ষণে লাঞ্চ খেতে গেছে গ্রেট ঈস্টর্নে। সেও যাবে আজ। ভাগ্যিস তার পকেটে দশ টাকার একটা নোট আছে।

পকেটে হাত দিয়ে সে দেখে নিলে নোটটা আছে কিনা।

গটগট ক'রে বেরিয়ে গেলো বীরেন, লিফ্‌টে নামবার সময় আয়নায়

চকিতে একবার দেখে নিলে নিজেকে। অন্য দিনের চাইতে তাকে আজ কিছুই আলাদা দেখাচ্ছে না। কিন্তু সে আজ আলাদা, দশ মিনিট আগেও যা ছিলো, এখন আর সে তা নেই। এখন সে অন্য মানুষ। এখন সে মানুষ। সে এখন ভয়শূন্য, সে এখন মুক্ত। মুক্ত, মুক্ত সে। সাহস এখন তার, শক্তি এখন তার—ভয় নেই, আর ভয় নেই।

তার বুক-পকেটে তিরিশ হাজার টাকার একটি চেক। ভুল করেনি সে, বার-বার দেখেছে, ভালো ক'রে দেখেছে। চিঠিতেও তাই লেখা। ক্রস্‌ওঅর্ডের জুয়োখেলায় এবার তার ভাগ্যে ফর্স্ট প্রাইজ, একেবারে তিরিশ হাজার।

এমন স্বচ্ছন্দ, দৃপ্ত পা ফেলে জীবনে সে কখনো হাঁটেনি।

বুকের কাছে, বুকের কাছে তার। শক্তি, মুক্তি, সাহস, তেজ, বীরত্ব। সব একটি ছোট্ট নীল কাগজে তার বুকের কাছে। তার সমস্ত শরীরে, শরীরের রক্তস্রোতে একটি আশ্চর্য উষ্ণতা। জগতের সমস্ত বোমা-বারুদের চাইতে প্রবল যে শক্তি, তাকে সে নিয়ে চলেছে বুকপকেটে ভ'রে।

তারপরেই তার মনে হ'লো কাল আর আপিসে আসতে হবে না। ইচ্ছে হ'লো চীৎকার ক'রে ওঠে, সামলে নিলে।

অত্যন্ত সহজভাবে সে ঢুকলো গ্রেট ঈস্টর্নে, যেন বছরের পর বছর রোজ সে ওখানেই খানা খাচ্ছে। চারদিকে একবার তাকালো। ঠিক! ঐ তো ধবধবে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঁড়ুয্যে ব'সে। বাঁড়ুয্যে খদ্দর ছাড়া পরে না। সঙ্গে তার শর্টস্‌-পরা লাল-মুখো একটা জনবুল। দু'জনে বিয়র খাচ্ছে।

ঠিক পাশের টেবিলটাতেই সে বসলো। নিবিষ্টমনে খাচ্ছে, মাঝে-মাঝে বিয়রের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে।

ব্রিটিশ কেমিকেল এজেন্সির ছোটো সায়েবের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বাঁড়ুয্যে ঘন-ঘন অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিলো। এ কি সত্যি? না কি, তার ভুল হচ্ছে? ভুল হবে কেমন ক'রে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও বীরেন। তবে কি বীরেনের আজ মাথা-খারাপ হ'য়ে গেলো?

শেষটায় মনের অস্বস্তি থেকে বাঁচবার জন্যেই ডাক দিলে, রোয়্।

তাড়াতাড়ি এক বোয়্ কাছে এসে দাঁড়ালো।

ইসারায় তাকে চ'লে যেতে ব'লে বাঁড়ুয্যে সায়েবটাকে বললে—এক্স্কিউজ মি। ঐ টেবিলে আমার একজন—একজন পরিচিত—এক মিনিট।

ব'লে উঠে গিয়ে পিছন থেকে বীরেনের কাঁধে হাত রাখলো।

—হ্যালো রোয়্, তুমি এখানে?

মৃদু একটু ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা সরিয়ে ফেলে বীরেন বললে, তোমাকে আসতে দেখেই এলাম। বোসো, বানরজি। একটা বিয়র?

বাঁড়ুয্যের কালো মুখে একটা গভীর হিংস্র রং আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়লো। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, You will regret it.

ব'লে পাশের টেবিলে গিয়ে বসলো। ওঃ, কতযুগের বিরাট একটা বোঝা নেমে গেলো বীরেনের বুক থেকে। সব সময় এই রোয়্ ডাক—তার নামের এই জঘন্য বিকৃতি—অসহ্য লাগতো তার। ঠিক 'বোয়্'-এর মতো শোনায়। নিজের মনে-মনে, বন্ধুদের কাছে, আপিসে ছাড়া আর সব জায়গায় বাঁড়ুয্যের নামের সে যা উচ্চারণ করে, আজ তাকে তা-ই ব'লে দিয়েছে মুখের উপর। ঐ একবার বানরজি ব'লেই তার মন কত হালকা হ'য়ে গেছে, কত সুস্থ বোধ করছে। উঃ, এত বিদ্বেষ নিয়ে কেমন ক'রে বছরের পর বছর সে বেঁচে থাকতো!

তারপর সে মন দিয়ে সম্পূর্ণ লাঞ্চটা খেলো। বাঁড়ুয্যে কখন উঠে গেলো টেরও পেলো না।

আপিসে ফিরে দেখলো তার টেবিলে থামে ভরা একখানা চিঠি, বড়োকর্তার নিজের এম্‌বস্‌ করা থামে। না-খুলেই বুঝলো তার মুক্তির পরোয়ানা এসছে।

ড্রয়ার থেকে সব কাগজপত্র বা'র করতে-করতে বললে—ওহে প্রমথ, আমি চললুম। এবার তোমার চান্স। ভালো কাজকর্ম কোরো।

প্রমথ হকচকিয়ে গেলো।—তার মানে?

—কাগজপত্রগুলো সব বুঝে রাখো; এ-সুযোগে যদি পব্লিসিটি অফিসার না হ'তে পারো তবে বুঝবো তুমি নেহাৎই গাধা।

—আপনি কি তবে······

—হ্যাঁ, আমি চললুম। এই ছাখো চিঠি। চিঠিতে কী আছে জানো। কাল থেকে আর আসতে হবে না।

বীরেন হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। প্রমথ একটু ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। হঠাৎ পাগল হ'য়ে গেলেন নাকি বীরেনবাবু?

বেয়ারা এসে বললে বড়োকত্তার ঘরে ডাক পড়েছে।

বীরেন রুখে উঠে বললে—তোমার কত্তাকে এখানে আসতে বলো। আমি এখন যেতে পারবো না।

প্রমথ ফিসফিস ক'রে বললে—কী ব্যাপার বীরেনবাবু? সত্যি নাকি? কেমন একটা ভয়ে তার যেন গলা অবধি শুকিয়ে যাচ্ছে।

সত্যি-সত্যি একটু পরে স্বয়ং মহেন্দ্র ব্যানার্জি সেখানে এসে দাঁড়ালো। কাছাকাছি যে যেখানে ছিলো সবাই উঠে দাঁড়ালো। শুধু ঘোষ উদাসভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলো। আর বীরেন খুব ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট বার ক'রে ধরালো।

বাঁড়ুয্যে চারদিকে তাকিয়ে বললে—বোসো তোমরা। রোয়্, আপিসের স্মোক করার নিয়ম নেই।

—আমি তা জানি, বানরজি।

—এক্ষুনি এই আপিসের বাইরে যাও ।

—এক্ষুনি যাচ্ছি। প্রমথকে কাগজগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—আর এক মিনিট এখানে না।

—বেশ। বীরেন উঠে দাড়ালো। যাবার আগে একটা কথা আছে আমার।

—সংক্ষেপে বলো।

—আমি জানতে চাই, বাঁড়ুয্যে, যে-ছেলেটাকে রক্তবমি করাতে-করাতে মারলে তার জীবনের দাম কে দেবে? অ্যাম্বুলেন্স ডেকে বাড়ি তো পাঠিয়ে দিলে, আর-কিছু করবে না?

—পাগল! উন্মাদ পাগল!

—টাউনহলে গিয়ে বক্তৃতা করবে, খবরের কাগজে নাম আর ছবি ছাপাবে, তোমরাই তো দেশের ত্রাতা। তবু, একটা চক্ষুলজ্জা তো আছে। পঞ্চুর বাড়িতে পাচশো টাকাই না-হয় পাঠিয়ে দিতে।

—আর একটি কথা যদি বলো তো দরোয়ান ডাকবো।

—তোমার দরোয়ান তোমাকে বাঁচাবে! আমাদের সকলের মতো ও-ও তো তোমার চাকর। কেউ তোমাকে বাঁচাবে না, বাঁড়ুয্যে; এক হাজার লোক প্রতিদিন উঠতে-বসতে তোমাকে শাপ দিচ্ছে। প'চে-প'চে মরবে তুমি! শুধু কি পঞ্চু! এতগুলো মানুষকে তুমি মারছো—আর তুমিই কি বাঁচবে!

—গেট আউট, ইউ সিলি ফুল!

সঙ্গে-সঙ্গে চটাস্ ক'রে একটা শব্দ হ'লো। বাঁড়ুয্যে জোয়ান লোক ব'লেই মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলো না, কিন্তু বীরেনের পাঁচ আঙুলের দাগ সঙ্গে-সঙ্গে তার গালে লাল হ'য়ে ফুলে উঠলো।

আশ্চর্য! দরোয়ান এলো না, পুলিশ এলো না, হৈ-হৈ হ'লো না ; বাঁড়ুয্যে আস্তে-আস্তে হেঁটে তার নিজের কামরায় চ'লে গেলো ; আর বীরেন থরথর ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ারে ব'সে পড়লো। সমস্ত আপিসে খানিকক্ষণ পিন-পড়া স্তব্ধতা।

তারপর নোটিশ এলো আপিস আজ ছুটি হ'য়ে গেলো।

প্রমথর প্রায় ফিট হবার অবস্থা হয়েছিলো ; অনেকক্ষণ পর অতি ক্ষীণস্বরে বললে—বীরেনবাবু, কী করলেন ?

—কিছুই করতে পারলুম না। যা চলছে, তা-ই চলবে।

—কিন্তু আপনার···

—আমার কোনো ভয় নেই। আমি আজ তিরিশ হাজার টাকা পেয়েছি।

কথাটা আস্তে-আস্তে সারা আপিসে ছড়িয়ে পড়লো। ঘোষ উঠে এসে বীরেনের হাত ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—কন্‌গ্র্যাচুলেশন্স। এই তো চাই! টাকা তো অনেকেরই আছে, বুকের পাটা ক'টা লোকের থাকে!

হরিহরবাবু এসে বললেন—দেখলেন, আজ আপনার উপর ভগবানের দয়া হয়েছে ব'লেই তো আমাদের হ'য়ে দুটো কথা কইতে পারলেন। বেশ করেছেন, মশাই, আরো দু-ঘা দিলেন না কেন? শালা চামার।

ছাতা চাদর নিয়ে এক-এক ক'রে সকলেই বেরিয়ে গেলো। আজ এক মুহূর্তে এরা যেন সকলেই নতুন প্রাণ পেয়েছে ; নিঃশ্বাসের বাতাসটাই যেন অন্যরকম। যে-জুজুর ভয়ে তারা দিনের পর দিন ম'রে আছে, সত্যি কি তার ভিতরটা তবে ফাঁপা? তাকে একটা চড় মারবার পরেও এভারেস্টের চুড়ো খ'সে পড়ে না, কি সমুদ্রের সব জল ডাঙায় উঠে আসে না, এমন কি, আপিসের দালান পর্যন্ত হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ে না—

কোনো প্রলয়, কোনো সর্বনাশই হয় না—সবই যেমন ছিলো তেমনি চলতে থাকে। তাহ'লে কি তারা খামকাই এত ভয় করে?

গেলো না শুধু প্রমথ আর ঘোষ। ঘোষ বললে—চলো রয় আমারি গাড়িতেই। আগে কোনোদিন বলেনি এ কথা, যদিও দু'জনে একই রাস্তায়।

বীরেন বললে, আমি একটু ঘুরে যাবো।

—চলো একসঙ্গেই যাই।

বেয়ারা একটা ছোট্ট চিরকুট নিয়ে এলো। বাঁড়ুয্যে নিজের হাতে লিখেছেন, বীরেনবাবু যাবার আগে একবার দেখা ক'রে গেলে তিনি খুসি হবেন।

ঘোষ ব্যাপারটা বুঝে বললে—যাও, দেখে এসো। আমি ব'সে আছি।

বীরেন যেতেই বাঁড়ুয্যে হাসলো। গালের পেশীগুলোতে এখনো আঙুলের দাগ স্পষ্ট। এই রকম নির্লজ্জ না হ'লে বুঝি জীবনে 'বড়ো' হওয়া যায় না।

—এই যে বীরেনবাবু। যা হয়েছে হ'য়ে গেছে। মনে রাখবেন না কিছু। আমি কিছু মনে রাখিনি

হাজার হোক্, বীরেন ভদ্রলোক। সে না-ব'লে পারলে না—আমিও দুঃখিত।

—না, না, ও কিছু না, ও কিছু না। বীরেন অবাক হ'য়ে শুধু বাঁড়ুয্যের গালের পেশীগুলো দেখতে লাগলো। হাসিতে তা অমন কানে-কানে বিস্তৃত হ'তে পারে তা বীরেন কখনোই ভাবতে পারতো না। এই হাসি এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলো?

—আপনি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে খারাপ

ভাববেন না, এই অনুরোধ। আপনার মতো গুণী লোকের কি আর চাকরির অভাব হবে! তবে আমাদের দিক থেকে সামান্য যেটুকু কর্তব্য— এই খামটার মধ্যে আপনার এ-মাসের, তা ছাড়া তিন-মাসের……না, না, ও আপনাকে নিতেই হবে।

—এটা পঞ্চুকে পাঠিয়ে দিন।

—পঞ্চুকে কিছু পাঠানো হয়েছে। তবে কী জানেন, আপনারা আজ একটা পঞ্চুকে দেখলেন—এক কলকাতাতেই কত হাজার পঞ্চু আছে তা গোনা যায় না। রাস্তায় প'ড়ে-প'ড়ে সব ম'রে থাকে। মোড়ে-মোড়ে কতগুলো জীবন্ত কঙ্কাল ছাখেননি ভিক্ষের জন্যে হাত বাড়ায়? কাকে আপনি দেবেন? কী আপনি করতে পারেন? সব পঞ্চুকে বাঁচাতে গেলে আমারই যে কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

—আপনার অস্তিত্ব থাকাই দরকার মনে করছেন কেন? তা ছাড়া, ভিক্ষা দেয়ার কথা তো হচ্ছে না। এ-সব কথা ব'লে কিছু হয় না। চলি।

—আপনার ইয়েটা—

মুহূর্তকাল দ্বিধা ক'রে বীরেন খামটা টেনে নিলে। সে ওঠবার ভঙ্গি করতেই বাড়ুয্যে বললে—একটা কথা। ক্রসওঅর্ডে তিরিশ হাজার টাকা পেয়েছেন শুনলুম। খুব সুখের কথা।

বীরেন চুপ ক'রে রইলো।

—বিজনেস-এ নামবেন?

—তা তো কিছু ভাবিনি এখনো।

—ব্যাঙ্কে ফেলে রাখলে আর কী হবে? অমোদের এরিয়ান ড্রগস্-এ ফেলবেন টাকাটা? গেলো বছর দশ পর্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিয়েছে, এবারে হয়-তো আরো বেশি দেবে। দশ পর্সেণ্টও বছরে তিন হাজার। কোনো

ভালো ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপজিটেও পাঁচ পার্সেণ্টের বেশি পাবেন না। তাছাড়া, অবশ্য আপনি যদি রাজি থাকেন, আপনার জন্যে একটা ভালো পজিশন-এরও ব্যবস্থা করা যায়—ধরুন, এই আপিসেরই ম্যানেজারি? আমার বাইরের কাজ এত বেড়ে যাচ্ছে যে এদিকে বেশি মন দিতে পারিনে আজকাল—আপনার মতো একজন নির্ভরযোগ্য লোক পেলে সুবিধে হয়। একটা কথার কথা হচ্ছে—ধরুন, তিনশোতে আরম্ভ করা গেলো, আচ্ছা, আরো পঞ্চাশ টাকা গাড়ির জন্যে ধরুন—সাড়ে সাতশো পর্যন্ত। এর সঙ্গে অবিশ্যি আপনার শেয়ারের টাকার সম্পর্ক থাকবে না। তা ছাড়া, তখন আপনারই কোম্পানি হবে, আপনি একজন পার্টনর—কাজেই তাকে ঠিক চাকরিও বলা যাবে না—আপনি আপনার নিজেরই চাকরি করবেন আরকি।

আকর্ণহাসি-বিস্ফারিত বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে তাকিয়ে এ-সব কথা শুনতে-শুনতে বীরেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো।

—আচ্ছা, আপনাকে আর আটকে রাখবো না, আপনাকে বলা রইলো: ভেবে দেখবেন। দরকার বোধ করলে জানাবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

সে বেরিয়ে আসামাত্র প্রমথ আর ঘোষ দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠলো—কী হ'লো?

—কী আবার হবে?

প্রমথ অতি করুণস্বরে বললে—আপনি তাহ'লে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন?

লজ্জায় বীরেন প্রমথর দিকে তাকাতে পারলে না। তিরিশ হাজার টাকা এমন আর-কী? খরচ করলে ক'দিন টিঁকবে? তার ব্যবসার বুদ্ধি নেই, কী করবে সে এই টাকা দিয়ে? আর স্ত্রীকে বললে তো···।

অসম্ভব, অসম্ভব। তিন লাখ যার আছে, তিরিশ হাজারকে অনায়াসে সে গিলে ফেলবে···কেমন ক'রে আটকাবে সে? কোথায় গেলো তার প্রচণ্ড শক্তি, কোন শূন্যে মিলিয়ে গেলো তার অবারিত, উচ্ছ্বসিত মুক্তি। হার হ'লো, শেষ পর্যন্ত হার হ'লো তার।

প্রমথ চুপি-চুপি বললে—আমি এখন পঞ্চুকে দেখতে যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?

—এখন?

ঘোষ কাছে এসে বললে—চলো রয়।

বীরেন বললে—চলুন।

ওদেরই একজন

—দেশপ্রিয় মিলের ছিয়াল্লিশ ইঞ্চি ধুতি—

—শ্যামল বাংলা ধুতি, পঞ্চাশ ইঞ্চি নক্সা পাড়—

—লাল পাড় শ্রী শাড়ি—

—পোস্ট্ গ্র্যাজুয়েট শাড়ি, সরস্বতী পাড়—

—মুলুক্‌রামের মোটা ধুতি দু' জোড়া—মোটা ধুতি—মোটা—

—মিস বেঙ্গল নাইন্টিন-থার্টিএইট্—

—ফরেসডাঙার কাঞ্চি ধুতি—কাঞ্চি—মুগা পাড়—না, কালো ফিতে পাড়—কালো ফিতে পাড় ফরেসডাঙা—

ধুপ্! ধুপ্-ধুপ্! ঝুপ্-ঝুপ্! ঝুপ্!

বস্তাগুলো পড়ছে। অতগুলো মাথার ফাঁক দিয়ে ঠিক এসে ফাঁকা জায়গাটিতে। ফেলবার কায়দা আছে। বস্তাগুলো পড়ছে, আবার খানিক পরে শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, ঠিক ধ'রে ফেলছে উপরি-ওলা। এক হাতে ধরছে, আর এক হাতে ফেলছে। প্রায় সার্কাসের কসরৎ।

—থান ধুতি, শ্রীদুর্গা মিলের থান ধুতি—

ভাঙা গলার আওয়াজ, যেন বাঁশ ফাঁড়ার শব্দ। ছোটো ছেলের

মানে-না-বুঝে আবৃত্তি-করা পদ্যের মতো সুরহীন কথাগুলো। কিন্তু চড়া পর্দাটা ঠিক আছে। ভাঙা গলার হাটে গলা-ছেঁড়া চ্যাঁচানো।

সবাই চ্যাঁচাচ্ছে।

খদ্দেররাও। মস্ত মোটা ঢ্যাপসা গিন্নি বেরি-বেরিতে পা ফোলা, গোরুর চোখের মতো চোখ; পেন্সন-পাওয়া টাক-পড়া রোগা বুড়ো, হাঁটুর ফাঁকে লাঠি, নকল দাঁত ঝকঝক করছে, এবার মধুপুরের বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন, যাচ্ছেন কার্সিয়ং, সেখানে নাকি শস্তায় জমি দিচ্ছে; উস্কোখুস্কো মাথা কলেজের ছাত্র, বগলে মাসিকপত্র, সিল্কের রুমালে মুখ মুছছে বার-বার, বাবাঃ এ তো কাপড় কেনা নয়, যেন যুদ্ধ করা (না কি বাংলা সিনেমার না কি ফুটবলের টিকিট কেনা?); তিনটি তরুণী, তাদের আঙুলে রং মাখা, পেন্সিলে ভুরু আঁকা, বাইরে মোটার দাঁড়িয়ে, উঃ বেরোতে পারলে বাঁচি; গরিব কেরানি, তিনদিনের দাড়ি, ময়লা কাপড়, পকেট সাবধান! চল্লিশ টাকা আছে, একমাসের মাইনে—কাল যাবে দেশে, ছেলেটা কত বড়ো হয়েছে কে জানে, শার্টটা কি ছোটো হবে?—ধবধবে খদ্দর-পরা বর্মা-চুরুট-মুখে ভদ্রলোক, প্রায় একশো টাকার জিনিস কিনছেন, কেউ-কেটা হবেন, কংগ্রেসের পাণ্ডা কি কর্পোরেশনের কাণ্ডারী, কি অন্তত কাউন্সিলের হোম্বর-চোম্বর। ঘেষাঘেঁষি, ঠেসাঠেসি, গোলমাল, চীৎকার, তাড়াহুড়ো; এতগুলো লোকের ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাসে ঘরের বাতাস বিষ; আর আটটা পাখা অবিশ্রান্ত ঘুরে-ঘুরে সে-বিষ আরো ভালো ক'রে সকলের নাকের ভিতর দিয়ে শরীরে চালিয়ে দিচ্ছে।

—কই মশাই, এখনো এলো না—

—এদিকে, মশাই, এদিকে—

—দু' জোড়া চাই, বুঝলেন, দু' জোড়া। কানে খাটো নাকি?

—সে কী! এ ছাড়া আর-কোনো পাড় নেই? কেমন দোকান!

—চা-র টা-কা চা-র আ-না! সর্বনাশ আরকি! সেবার ঠিক এই কাপড়ই নিয়ে গেলুম তিন টাকা সাড়ে-চোদ্দ আনায়—

—এ-সব লতা-পাতা-ফুল চাইনে। ভদ্দরলোকে যে কাপড় পরতে পারে তা-ই দেখান।

শেষের কথাটা বললে উস্কোখুস্কোচুল কলেজের ছাত্র। হঠাৎ মুরারি বললে—কেন, অ্যারিস্টক্রাটিক মহলে তো এ-কাপড় আজকাল খুব চলেছে।

—কী? কী বললে? অ্যারিস্টক্রাটিক? মানে জানো? বানান জানো? তোমার কাছে এখানে ফ্যাশান শিখতে আসিনি, যা চাই তা-ই দাও।

—যা আছে আমাদের, দেখছেন তো?

—আর নেই?…আর আছে কিনা শুনতে চাই।

—কী রকম চাই আপনার?

—কী রকম চাই তা কি ছবি এঁকে দেখাতে হবে? নিয়ে এসো যা আছে, আমি বেছে নেবো।

—ক' জোড়া নেবেন?

—ক' জোড়া নেবো তা দিয়ে তোমার দরকার কী? শিগগির! আর দেরি করতে পারিনে।

—ওঃ, নেবেন তো একখানা ধুতি, তার জন্যে এত!

কথাটা ব'লে ফেলেই মুরারির মুখ নীল হ'য়ে গেল।

—কী, কী বললে? এত সাহস তোমার, বেয়াদব ছোটোলোক ইতর! তোমাদের দোকানের সমস্ত কাপড় আমি দেখবো, তবে উঠবো এখান থেকে।

সমস্ত কলরব ছাপিয়ে উঠলো তীব্র ক্রুদ্ধ স্বর, হাতের ভাঁজ-করা মাসিকপত্রটাকেই একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্রের মতো তুলে ধ'রে শাসাচ্ছে।

—কী হয়েছে, কী হয়েছে মশাই?

—কোথায় তোমাদের দোকানের কর্তা—ডাকো তাকে। দেখে নেবো আজ,আমি।

এক কোণে একটি লোক তথাগত বুদ্ধের মতো গম্ভীর মুখে ব'সে, সামনে তার এ টি ক্যাশবাক্স, সমস্ত দোকানের মধ্যে তার মুখেই সব চেয়ে কম কথা, নড়াচড়াও সে বিশেষ করে না। আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সে ক্যাশমেমো লেখা তার কাজ; তারপর খুচরো পয়সা ক্যাশমেমোর হলদে কাগজটায় জড়িয়ে নিপুণ কৌশলে ঠিক জায়গাতে ছুঁড়ে দেয়। ইনিই দাশরথি দাস, পূর্ববঙ্গ বস্ত্রালয়ের একমাত্র স্বত্বাধিকারী। কলকাতায় চারখানা বাড়ি, দেশে বিস্তর জমি-জমা, ব্যাঙ্কের অদৃশ্য নদীটি প্রতি মাসেই সুদের স্রোতে স্ফীত হচ্ছে। সবই এই কাপড়ের দোকান থেকে। ইচ্ছে করলে দাশরথি আজ পায়ে পা তুলে আরাম করতে পারতো। কিন্তু প্রায় ইস্কুলের পাঠ্য-কেতাবে লেখবার মতোই তার জীবনচরিত। এখনো বারো ঘণ্টা ঠায় দোকানে ব'সে থাকে, কাপড়ের বস্তার মতোই মোটা শরীর নিয়ে চ্যাপ্টা হ'য়ে। নিজে না-দেখলে ব্যাটারা সব ফাঁকি দেয়। ক্যাশমেমো কাটে, একটা লোকের মাইনেও বাঁচে। তাছাড়া, ক্যাশটা সব সময়ই নিজের হাতে রাখা ভালো।

গোলমাল শুনে দাশরথি এগিয়ে এলো। এগিয়ে আসার ধরনটা অদ্ভুত; শরীরের পশ্চাদ্দেশটা ফরাসের উপর ঘষড়াতে-ঘষড়াতে তার অগ্রসরণ। যেমন ক'রে আতুর ভিখিরি রাস্তা পার হয়। কাছে এসে উঠে দাঁড়ালো, দাঁড়াতেই থাটো ধুতির কাছাটা গেলো খুলে! সেটা বাঁ হাতে লাগিয়ে নিয়ে বললে—কী হয়েছে ভাই?

—ভাই কাকে বলছেন? আপনি আমার ভাই হ'লে লজ্জায় আমি আত্মহত্যা করতুম।

চারদিকে একটা হাসির মৃদু শব্দ উঠলো।

—কী হয়েছে, মশাই ?

—মশাই-মশাই বলবেন না। এখানে আপনার সঙ্গে এয়ার্কি দিতে আসিনি, আপনার জিনিস কিনতে এসেছি।

—ব্যাপারটা কী, জানতে পারি ?

—আপনার এই লোকটি অতিশয় ইতর।

—কেন, কেন, কী হয়েছে ?

—আপনাদের এখানে কি ধুতি পাওয়া যায় ?

—নিশ্চয়ই। সবরকমের ধুতি আছে। কত দামের মধ্যে চাই আপনার ?

—পঞ্চাশ টাকা জোড়ার কাপড় চাই। আছে ? দিতে পারবেন ? ও, তোমারই এই দোকান বুঝি ? কর্মচারীদের ঠিক শিক্ষাই হয়েছে। দোকান খুলে বসবার আগে কথা বলতে শিখতে হয়, বুঝলে ?

এই অপমানেও বিশেষ বিচলিত না হয়ে হাজার-হাজার টাকার কারবারি দাশরথি দাস বললে, বসুন আপনি, আপনাকে ধুতি দেখাচ্ছি।

—ওঃ, বড়ো দয়া হয়েছে আমার উপর মনে হচ্ছে ? যত সব ধূর্ত ছোটোলোক ! দোকানদারি ক'রে খাচ্ছে, এদিকে ভাবখানা যেন উনি আমার আপিসের বড়ো সায়েব ! দাঁড়াও না, কাগজে এমন লেখা লিখবো—আমাদের পাড়া থেকে তোমার এই অসভ্য দোকান ওঠাবো, তবে ছাড়বো।

রাগে গজগজ করতে-করতে কলেজের ছাত্রটি হনহন ক'রে চ'লে গেলো বাইরে।

মিহি ও মোটা গলায় মন্তব্য :

—ছোকরার বুকের পাটা আছে। বেশ দু'কথা দিয়েছে শুনিয়ে।

—সাত্য, এই কাপড় কেনা ! ভাবতে গায়ে জ্বর আসে।

—মাথা-গরম! ও-বয়সে নিজেকে রাজা-মহারাজা মনে হয় কিনা। এখনো এম. এ. পাশ করেনি বোধ হয়।

—আজকালকার ছেলেরাই এইরকম! আই কল্ ইট্ ভল্‌গার ইমপেশেন্স।

—পেশেন্স! (নিচু গলায় তিন তরুণীর একজন) পেন্সন-পাওয়া বুড়োর কাজকর্ম নেই, সময় কাটলেই খুসি। একখানা শাড়ি কিনতে আধ ঘণ্টা! মানুষের সময়ের যেন দাম নেই।

—এত বড়ো দোকান কি এ-ক'জন লোকে চলে! কেবল মুনফা, কেবল মুনফা! খদ্দেরের সুবিধের কথা ভাবে নাকি ওরা! কাপড় তো আর এমন জিনিস নয় যে না-কিনলেও চলে। আর এই পুজোর সময়···

—বাঙালির মতো এত খারাপ দোকানদার আর নেই, সত্যি।

—আহা, এই লোকগুলোও তো মানুষ, অত ব্যস্ত হ'লে চলে!

—আমরাও মানুষ মশাই, আমরাও খেটে-খুটে খাই। পয়সা রোজগার করতে তো প্রাণ বেরিয়ে যায়, পয়সা খরচ করতেও যদি···

—দশজন লোকে না চলে পনেরোজন রাখবে, পনেরোজনে না চলে পঁচিশ জন। দোকানের বেশি লাভ হবে ব'লে আমরা ভুগবো কেন?

—আর মশাই, ব'লে আর লাভ কী, ব্যবসা মানেই এই। সব চেয়ে কম দিয়ে সব চেয়ে বেশি আদায়ের চেষ্টাই···

—চোর! চোর! সব ব্যাটাই চোর আজকাল···দাঁতে দাঁত চেপে তিনদিনের দাড়িওলা কেরানি বললে; মোটরে গেলে নমোনমো, পকেট কাটতে গেলেই দমাদম! সব সমান, সব সমান। অপরাধ নিয়ো না বাবা, পেন্নাম হই ছিচরণে।

কেরানিটি বত্রিশ টাকায় ঢুকেছিলো, এখন বিয়াল্লিশ পাচ্ছে। গেলো

বছর থেকে তার মাথা একটু খারাপ হয়েছে। বিড়বিড় ক'রে নিজের মনে কথা বলে অনেক সময়।

দস্তুরমতো একটি জটলা হ'য়ে গেলো পূর্ববঙ্গ বস্ত্রালয়ে। সেই খদ্দরধারী ছাড়া সকলেই কিছু-না-কিছু বললে। তিনি একশো টাকার নোট দিয়ে দু'টাকা সাড়া তিন আনা ফিরিয়ে নিলেন। কোনো দিকে দৃকপাত না ক'রে উঠলেন মোটারে গিয়ে, মুকুন্দ তাঁর সওদা তুলে দিয়ে এলো।

—বড়ো খদ্দের এলে ছোটো খদ্দেরকে চোখেই ছাখে না এরা। ও মশাই, শুনছেন, আমরা কি আপনার উমেদার যে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন!

—কে হে এই খদ্দর-পরা লোকটা? লুক্‌স্ সম্‌বডি।

—হবেন। হয়তো রেড়ির তেল বেচে পয়সা করেছে, এবার কংগ্রেসি মাতব্বর হ'য়ে বসবেন। আর কংগ্রেস! সবই পয়সা হে, সবই পয়সা! বড়োলোক ছাড়া কাউকে দেখেছো কংগ্রেসে পাত্তা পেতে।

—চেপে যা! চেপে যা! বড়োলোকের হিংসেয় বুক ফেটে মরবি তো।

দোকানের পিছনে ছোট্ট একটা খুপরি, সেটা 'আপিস' ঘর। আপিসে সরঞ্জামের মধ্যে একটা টেবিল, এক-হাতল-ওলা চেয়ার একটা, টেবলফ্যান, শিষের কাগজ-চাপা আর ব্রোঞ্জ-ব্লুতে দোকানের নাম-ছাপানো কয়েকটা কাগজ। সেখানে ডাক পড়লো মুরারির।

দাশরথি বললে—কী হে!

মুরারি চুপ।

—বলি, কাজকম্ম করবার ইচ্ছে আছে, না কি হীরের খনি পেয়েছো?

—ঐ একটা ফঁচকে ছোঁড়া অত গালিগালাজ ক'রে গেলো—লজ্জা করে না তোমার আমার সামনে এসে দাঁড়াতে?

মুরারি মুখের চিবোনো পানটাকে বাঁ গাল থেকে ডান গালে বদলি করলে।

—আবার পান চিবোনোও হচ্ছে! ফের যদি দোকানের মধ্যে তোমাকে পান চিবোতে দেখি এক চড় মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো। বয়াটে লম্পট রাস্কেল!

মুরারির গালের পেশীগুলো মুহূর্তে থমকে গেলো।

—ছোঁড়ার তেজ কী! যা নয় তাই মুখের উপর ব'লে গেলো। কিনবেন তো একখানা মিহি ধুতি! যত সব···! আবার বলেন কিনা কাগজে লিখবো! ছোাঃ! লিখলেই হ'লো কিনা। বিজ্ঞাপন দিচ্ছি না সব কাগজে! তা এও বলি, খদ্দের তো, একটু বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয়। এই তো এখন এই নিয়েই বলাবলি করছে সবাই। দোকানের একটা নাম-ডাক আছে তো। মগজে কি কিছু নেই তোমাদের? মা-বাপ কি ঘাস খাইয়ে মানুষ করেছে?

মুরারি চুপ।

—যাও, এখানে দাঁড়িয়ে আর রূপ দেখাতে হবে না। কাজ করোগে। এবার তোমাকে দু'টাকা ফাইন ক'রেই ছেড়ে দিলুম, পরে যেন আর-কিছু না শুনি। সাবধান।

মুরারি বেরিয়ে এলো। মস্ত কোলাব্যাঙের মতো থপথপ করতে-করতে দাশরথিও এসে বসলো ক্যাশবাক্সের কাছে। রাত এগারোটা বাজে। এখনো নতুন-নতুন খদ্দের আসছে। কাল সপ্তমী।

মাথা-কামানো গেরুয়া-পরা একটি লোক আস্তে-আস্তে দোকানে ঢুকে সোজা দাশরথির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। একগাল হেসে মুরারি বললে—আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক্।

গেরুয়াধারী ব'সে পড়ে বললে—তারপর? কী খবর? কেমন চলছে?

—আর কেমন! বেচাকেনা প্রায় বন্ধ। কোনোরকমে বেঁচে আছি আরকি। এই ক'টা দিনই যা দু'টো খদ্দেরের মুখ দেখি। কালও কিছু হবে। তারপরেই শুঁটকি। আদ্ধেক লোক থাকবেই না কলকাতায়। কী যে এক হিড়িক হয়েছে—সবাই বেড়াতে যাচ্ছে! তিরিশ টাকা যে পায় সে-ও যাচ্ছে, তিন হাজার যে পায় সে-ও যাচ্ছে। রেল কোম্পানিরই লাভ!

—বলেন কেন আর! ডিহিরি, শিমুলতলা, কালিম্পং ছাড়া কথাই নেই কারো মুখে! কেউ কি দেশে যাচ্ছে? কেউ না? দেশকে সবাই ভুলে যাচ্ছে! একদিকে লুটছে রেলকোম্পানি, আর একদিকে ছুটছে খোট্টা উড়ে খাসিয়া নেপালির দল। বাঙালি বাঙালিকে ভুলেছে ব'লেই তো আজ এই দশা!

—গেছে, উচ্ছন্নে গেছে বাঙালি। কেবল নবাবি, কেবল লোক-দেখানো চালিয়াতি! যে যা-ই পাচ্ছে, কারোরই নাকি খরচ চলে না। এই দেখুন না, এরা সব কাজ করছে আমার এখানে। পঁচিশ টাকার কম কাউকেই দিই না। তাও নালিশ লেগেই আছে, খরচ নাকি চলে না। মাসে পাঁচ টাকার সিগারেট ফুঁকলে কী ক'রে চলবে! তাছাড়া বারো মাস ব'সে ব'সে হাই তোলা। ঝকমারি মশাই, দোকানপাট চালানোই ঝকমারি! মিছিমিছি এতগুলো ছাগলকে পোষা। আপনাদের মঠ কেমন চলেছে?

—আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে—

—হ্যাঁ, আপনাদের লাইনই তো আজকাল লাইন। একটি পয়সা ফেলতে হয় না, কোনো ঝকমারি নেই, গেরুয়া আর বাংলা গীতা—কী বলেন? তা আজকাল তো সিল্কের গেরুয়াও বেরিয়েছে। আপনি তো আজকাল যোগানন্দ স্বামী?

—ভক্তরা খুসি হয় না তা না-হ'লে।

—বেশ, বেশ। তা স্বামীজি, ছেরামপুরে আপনারা কাপড়ের মিল ফাঁদছেন শুনলুম ?

—লোকের কথায় কান দেবেন না, দাশরথিবাবু। তবে হ্যাঁ, ও-রকম একটা কথা হচ্ছে, আসবো আর-এক সময় আপনার কাছে, কিছু শেয়ার—

—নিশ্চয়ই ! আপনারা করলে আমি আছি পিছনে। মুস্কিল কী, বেশির ভাগ লোককেই বিশ্বাস করা যায় না। করুন না একটা মিল। বেশ তো। এই কাপড়ের বাজার তো খোট্টারাই লুটে নিলে। দুঃখের কথা আর বলবো কী আপনাকে, আমাদের সব বাবুরা তো খোট্টাই কাপড় ছাড়া তাকিয়েই ত্মাখেন না। বাঙালি মিলের কাপড় একটু মোটা কিনা ! বিলাসিতাতেই আমরা গেলাম।···মুকুন্দ !

—আপনাকে একজন ডিরেক্টর করবার কথা—

একগাল হেসে দাশরথি বললে—কী যে বলেন ! কত সব হাতি-ঘোড়া আছেন, আমি তো সামান্য চুনোপুঁটি। খুচরো দোকানদারি ক'রে পেটে-ভাতে আছি আরকি টিকে। যা দিনকাল !···মুকুন্দ ! আনন্দ, মুকুন্দ কোথায় হে ?

—আজ্ঞে, একটু বাইরে গেছে।

—কতক্ষণ ধ'রেই তো দেখছি না ওকে।···তা এ-বছরই আরম্ভ করবেন নাকি মিল ?

—দেখি। কাল একটু হরিদ্বার যাচ্ছি বাবা অভয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করতে।

—বেশ, বেশ, ধর্মই তো খাঁটি জিনিস। আমাদের জীবন এই সিকি দুয়ানি গুনেই কাটলো। কিছু হ'লো না।

—সে কী কথা ! আপনাদের জোরেই তো ধর্ম টিঁকে আছে।

মুকুন্দ এসে দাঁড়ালো।

—ডেকেছিলেন আমাকে ?

—কোথায় যাওয়া হয়েছিলো ?

—বাইরে গিয়েছিলুম।

—বাইরে কেন ?

—পেশাপ করতে, অম্লানমুখে বললে মুকুন্দ।

—পেশাপ করতে! পেশাপ করতে এক ঘণ্টা লাগে নাকি! বিড়ি ফোঁকা হচ্ছিলো ? নাকি রসচর্চ্চা হচ্ছিলো হ্যা ?

বেশ চড়া গলাতেই বললে কথাটা, দু' একজন খদ্দের চোখ তুলে তাকালো।

—কাজের সময় এ-সব চলবে না ব'লে দিচ্ছি।

মুকুন্দ বিরাট একটা হাই তুললো।

—কী হে খোকাবাবু, ঘুম পাচ্ছে ? কখন আসা হয়েছে দোকানে ?

—সকাল সাতটায়।

—তা আমি তো সাড়ে ছ'টায় এসেছি। খাওয়ার ছুটি কতক্ষণ ?

—আধ ঘণ্টা।

একটুও দিবানিদ্রা হয়নি বুঝি ? গড়াগড়ি ঢলাঢলি কিচ্ছু না ? যাও, যাও, কাজ করোগে। এবার বোনাস্ পাচ্ছো সে-খবর রাখো তো ?

—আজ্ঞে ?

—দশ টাকা ক'রে বেশি মাইনে পাবে এ-মাসে। বুঝেছো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এ-সব কথা তো দিব্যি মগজে ঢোকে দেখছি। যাও এখন।

মুকুন্দ চ'লে গেলো।

স্বামীজি বললেন—আমিও উঠবো। এবারে আমাদের মঠে পুজোর পার্বণীটা—

—ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। দাশরথি ক্যাশবাক্স খুলে গুনে-গুনে দশখানা দশ টাকার নোট বা'র ক'রে দিলো।—যাবো একদিন আপনাদের মঠ দেখতে।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

—দেখুন, একটা কথা।···যোগানন্দর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস ক'রে দাশরথি কী বললে। শুনতে-শুনতে গেরুয়া-পরা স্বামীজির নিচের ঠোঁটটা হাসিতে ঝুলে পড়লো।

—মনে থাকবে তো?

—খুব থাকবে।

গলা খাটো ক'রে দাশরথি বললে, ঐ একশো টাকার মধ্যেই কিন্তু চালিয়ে নেবেন, আপনার কমিশন সুদ্ধু। আপনারা সন্নেসি মানুষ—নির্ঝঞ্ঝাট। সেবারের মতো বাজে মাল ঠেলবেন না যেন। ধুমসো লাস—এদিকে টাকার খাঁকতি বিষম! আর পোষায় না এ-সব। ভাবছি একদিন আপনাদের মঠেই ঢুকে পড়বো।

—হ্যাঃ হ্যাঃ! ঘোড়ার মতো হেসে উঠলেন স্বামীজি। আচ্ছা, আসি এখন। নমস্কার।

স্বামীজি চ'লে গেলেন।

বারোটা বাজলো, সাড়ে-বারোটা বাজলো। কুড়ি মিনিটের মধ্যেও দোকানে যখন আর-একটি খদ্দের ঢুকলো না, তখন দাশরথি চেঁচিয়ে বললে—এবার বন্ধ করো হে! কাল আবার ছ'টাতেই খুলতে হবে।

রাস্তায় বেরিয়ে মুরারি আর মুকুন্দ লম্বা কয়েকটা নিঃশ্বাস নিলে। এতক্ষণে পুজোর বাজার ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা হাওয়া। রাস্তা ফাঁকা। শুধু

কয়েকটা পানের দোকান খোলা। দোকান সব বন্ধ, রাস্তায় তাই আলোর চাইতে অন্ধকারই বেশি। কালচে ট্রাম-লাইনের উপর হঠাৎ এক-এক জায়গায় গ্যাসের আলো প'ড়ে জলের মতো চকচক ক'রে উঠছে।

প্রায় উনিশ ঘণ্টা ঐ ভিড়, গোলমাল, বদ্ধ হাওয়া আর নতুন কাপড়ের গন্ধ। তারপর এই ফাঁকা রাস্তা, খোলা হাওয়া।

—ঘুম পাচ্ছে নাকি মুকুন্দ ?

—এক সময়ে খুব পাচ্ছিলো। এখন আর পাচ্ছে না।

—বিড়ি দে একটা।

মুকুন্দ বিড়ি বার করলে। পানের দোকানের জ্বলন্ত দড়ি থেকে দু'জনে ধরালে বিড়ি। মুরারি বললে—চল্।

মুকুন্দ বললে—তোর তো বৌ আছে ভাত নিয়ে ব'সে, আহ্লাদে ডগমগ করছিস। আমার তো সেই মেসের তক্তপোষ।

—চল্ একটু হাঁটি।

হাঁটতে-হাঁটতে মুকুন্দ বললে—এবার দশ টাকা বোনাস।

—হেগে দে ঐ টাকার উপর।

—তোর দু'টাকা ফাইন হয়েছে শুনলাম।

—দাশু আজকাল তিনটে মাগি পুষছে জানিস তো ?

—তা দশটা পুষলেই বা মারে কে !

—হ্যাঁ, দশটা ! কিপটে কঞ্জুষ ! ঐ দু'টাকা দিয়ে একটাকে রুপোর কানবালা কিনে দেবে আরকি। চল না, দাশুকে ধরি গিয়ে রাস্তায়।

—এখন ?

—এখনই তো ! শালা তো হেঁটেই ফেরে টালিগঞ্জে। এত রাত্রে রিকশা নিলেও তো অন্তত চার গণ্ডা পয়সা। চামার ! চোদ্দপুরুষ চামার !

মুকুন্দ বললে—তোর হয়েছে কী বল্ তো ? বড়ো যে মুখ ফুটেছে !

—ভারি ফুর্তি লাগছে আমার আজ। একটু মাল টানলে হ'তো।

—হ্যাঁ ! বৌ দেবে'খন গলাধাক্কা !

—আরে চ্ছ্যাঃ ! আমাদের আবার বৌ ! খায় তো আধ পেটা, মারে তো লাথি ঝাঁটা। একদিন কারো সঙ্গে ভেগে পড়ে তো বাঁচি।

—তোর একটা ছেলে হয়েছিলো না রে ?

—কবে ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে। আপদ গেছে।

—দাশুর কিন্তু ছেলেপুলে নেই। এত টাকা খাবে কে ?

—ওর পিণ্ডি এসে খাবে। দে না একদিন ওর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে। আছিস্ কী কর্তে তোরা ! ছেলেপুলে হবে কোত্থেকে—আছে নাকি কিছু ওর ভিতরে ! বৌটাকে তো বাঁজা ব'লে বাপের বাড়ি বিদেয় করেছে। এদিকে বাড়িতে হারেম। শালা আবার বাইরে বেরোয় না—পাছে কেউ দেখে ফ্যালে।

—দেখলেই বা কী ! পয়সা আছে, কেউ কিছু বললেও ব'য়ে গেলো। আর ব্যামো হ'লে চিকিচ্ছেরও ভাবনা নেই।

—চিকিচ্ছে হ'লেই হ'য়ে গেলো—না ? দেখবি, প'চে প'চে মরবে—বেশি দেরি নেই। একটা-একটা ক'রে আঙুল খসবে, নাক খসবে, কান খসবে, চোখ দিয়ে পুঁজ পড়বে, গলা দিয়ে গু বেরিয়ে আসবে।

—তোর বাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে এলি, মুরারি।

—চল্ না। দাশুকে দুটো কথা ব'লে যাই। তাড়াতাড়ি হেঁটে চল্।

টালিগঞ্জের পুলের কাছাকাছি এসে মুরারি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।—ঐ দেখছিস ?

গ্যাসের আলোয় দাশরথির গায়ের জামাটা চকিতে দেখা গেলো।

—ওর বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি চল্।

মুকুন্দ হঠাৎ খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

—কী রে, ছেলেমানুষের মতো হাসছিস কেন? ভয় করছে নাকি একটু-একটু?

—না, না, ভয় কিসের। এমনিতেও খেতে পাচ্ছিনে, অমনিও পাবো না। ভয় করছে না—ভারি মজা লাগছে, ভারি মজা! হি-হি!

—আস্তে!

আর দশ গজ গেলেই দাশরথির বাড়ি। বালিগঞ্জে একটা ব্রাঞ্চ খুলেছে, সেখানে ভাইকে বসিয়েছে। দু'দিন নিজে যায়নি, কাল ভোরে উঠেই যাবে। এবার পুজোটা মন্দ হ'লো না। ব্যবসার হাওয়া ফিরেছে।

হঠাৎ টের পেলো পিছনে দু'জন লোক। ফিরে তাকাতেই তারা দাঁড়িয়ে গেলো। হুমকি দিয়ে উঠলো দাশরথি—মুরারি আর মুকুন্দ না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব'লেই মুরারি দাশরথির ডান গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বললে—তোমার বাপের নাম কী? সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দ বাঁ গালে এক চড় মেড়ে বললে—পেশাপ করতে কতক্ষণ লাগে? তারপর হো-হো ক'রে হেসে উঠলো দু'জনে।

দাশরথি প্রথমটায় একেবারেই থতমত খেয়ে গেছল, কিন্তু পরের মুহূর্তেই মাথা নিচু ক'রে ষাঁড়ের মতো ওদের দিকে রুখে এলো। চেঁচিয়ে বললে, শালা শুয়ারকা বাচ্চা শয়তান, পুলিশে দেব, জেল হবে, ফাঁসি হয়ে যাবে!

মুকুন্দর একটা হাত সে ধ'রে ফেলেছিলো, কিন্তু এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মারলে সে দাশুর ভুড়ির উপরে এক লাথি। সঙ্গে-সঙ্গে নাকের উপর এক ঘুষি মুরারির হাতের।

মস্ত মোটা মানুষ, চল্লিশের উপরে বয়েস, দম ফুরিয়ে গিয়ে এঞ্জিনের মতো হাঁপাতে লাগলো।

আবার হেসে উঠলো দু'জনে হো-হো ক'রে। মুকুন্দ ধরলে ওর হাত দুটো চেপে, আর মুরারি দু'গালে দুটো ক'রে চড় দেয় আর বলে—তোমার বাপের নাম কী ?

—কী শালা, বাপের নাম মনে আছে ? ঠাস্! বাপের নাম ভুলেছিস ? মনে আছে ? ঠাস্! ভুলেছিস ? ঠাস্! বল্ ভুলেছিস, নয়তো কিছুতেই ছাড়বো না।

দাশরথি ততক্ষণে চোখে মুখে অন্ধকার দেখছে। মাথার ভিতরটা বোঁ-বোঁ করছে। মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

—বল্, বল্ শিগগির। ফ্যাল্ তো ওকে রাস্তার উপর, মুকুন্দ।

ধাক্কা খেয়ে পড়লো উল্টিয়ে দাশরথি রাস্তায় চিৎ হ'য়ে। ওর মুখের উপর জুতোসুদ্ধ পা-টা চেপে ধ'রে মুরারি বললে—এখনো কি বাপের নাম মনে আছে ?

শুধু একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা গেলো।

মুকুন্দ বললে—থাক্, আর না। ম'রে যাবে শেষটায়।

মাথার চুলগুলোর মধ্যে একবার হাত বুলিয়ে মুরারি বললে—চল্, যাই এবার। থাক্ লাসটা ওখানেই প'ড়ে।

খানিকক্ষণ ওরা চুপচাপ হাঁটলো, লম্বা-লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। কালিঘাটের কাছাকাছি এসে মুকুন্দ বললে—ম'রে যায়নি তো ?

—দূর ক্ষ্যাপা! মরবে কী রে ? ক্যাঁ কোঁ করতে-করতে উঠলো ব'লে! হাঃ হাঃ, আজ আর শালাকে কোনো শালিও পুছবে না। একা শুয়ে কঁকিয়েই কাটাবে রাতটা।—একবার উঠতে পারলেই তো লাগাবে পুলিশে গিয়ে।

—ব'য়ে গেছে। উঃ, বড্ড খিদে পেয়েছে রে।

—আমার যা ঘুম পাচ্ছে!

—বাড়ি ফিরে এক থালা ভাত খাব, তারপর যে ঘুমুবো আর উঠবো পরশু ছুপুরে।

—হাঃ-হাঃ! আর আমাদের কাজ নেই! আর সক্কালবেলা উঠতে হবে না। আর রাত্তির একটায় ফিরতে হবে না। কী মজা! কিন্তু চাকরিটাও তো গেলো।

—যাক্‌গে। কত চাকরি জুটবে। আরে ঐ দাশুটাকে যে মাগি জোটায় সে কম-সে কম একশো টাকা কামায়, জানিস?

—তুইও ও কাজে লাগবি নাকি?

—আরে ছ্যাঃ! ও-সব কাজ ভদ্দরলোকেই পারে।

—হ্যাঁরে মুরারি, তুই ইস্কুলে পড়েছিলি?

—ইস্কুলে! আর একটু হলেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতাম। তোকে ইংরাজি শেখাতে পারি জানিস? আসিস আমার কাছে কাল থেকে, পাঁচ টাকা ক'রে মাইনে দিস।

—আসবো। এ ফ্যাট ক্যাট স্যাট অন এ ম্যাট—ঠিক না? হো-হো ক'রে হেসে উঠলো মুকুন্দ—ফুর্তি যেন আর ধরে না।—আমি এসে গেছি। এবার গিয়ে মেসের তক্তপোষ।

—যা ঘুম দে গে ঠাসা। কাল ছুপুরে তোর নেমন্তন্ন রইলো আমার এখানে। আসিস কিন্তু।

মুকুন্দ তার গলিতে ঢুকেছিলো, চেঁচিয়ে বললে—কী খাওয়াবি?

—যা খেতে চাস! চেঁচিয়ে জবাব দিল মুরারি।

—পোলাও মাংস কোর্মা কাবাব ইলিশ ভেটকি রসোমালাই!

—বেশ, তা-ই খাওয়াবো।

—বৌকে ভালো ক'রে রাঁধতে বলিস।

—আসিস কিন্তু—।

—আসবো—।

গলির একটা বাঁকে মুকুন্দ অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। একা, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চললো মুরারি।

মানুষটা সে বেশি লম্বা নয়, রোগাও বটে; কিন্তু এখন তার চলবার সহজ মুক্ত ছন্দটা যেন ফুর্তির একটা ফোয়ারার উপচে-পড়া। কাঁধ দুলিয়ে-দুলিয়ে গুনগুন গান করতে-করতে সে চললো হেঁটে, রাত দুটোয় শূন্য প'ড়ে আছে নির্জন রাস্তা; কালিঘাটে ট্র্যাম ডিপোর কাছে কিছু লোকের জটলা—তাদের সে ছাড়িয়ে গেলো মাথা উঁচু ক'রে সতেজ নির্ভয় পা ফেলে-ফেলে—হঠাৎ যেন ঐ সমস্ত মানুষের চাইতে অনেক বড়ো হ'য়ে গেছে সে। তারপর আবার যখন নির্জন রাস্তায় এসে পড়লো, তার গুনগুনানি উচ্চ স্বরের গান হ'য়ে উঠলো, ঘুমন্ত সহরের হাওয়ায় ঢেউ তুলে বেজে উঠলো তার খোলা গলার উচ্ছল খুসির সুর—

আমায় আর মেরো আর মেরো না
নয়নবানে সখি গো—
আমি বিকিয়েছি সব হারিয়েছি সব
তোমার টানে
শুধু তোমার টানে
সখি গো———।

সমস্যা

'পারিনে আর তোমার বইয়ের জ্বালায়', স্বামীর টেবিল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে মায়া বললে। টেবিল তো নয়, আস্ত একটি আবর্জনার স্তূপ। চৈত্রমাসের ঝ'রে-পড়া শুকনো পাতার মতো বই, কাগজ, চিঠিপত্র ছড়ানো ছিটানো: কোনো বই পাতা-খোলা চিৎ হ'য়ে শুয়ে, কোনো বই কাৎ হ'য়ে প'ড়ে, কয়েকটা পাতার কোণ দুমড়ানো, কোনো বইয়ের ভিতর থেকে একটা ফাউণ্টেন-পেন বেরিয়ে আছে, গতরাত্রে পেজ-মার্ক হিসেব রাখা হয়েছিলো।

'এই তো!' মায়া ব'লে উঠলো। 'এক্ষুনি কলম কই! কলম কই! ব'লে চ্যাঁচামেচি স্নুরু করতে তো! তোমাকে নিয়ে আর পারিনে।'

সত্যি, এমন বিশৃঙ্খলা! রোজ দু'বেলা মায়া প্রাণপণে টেবিল গুছোয়, ধুলো ওড়ে, ওড়ে বাজে কাগজ ছেঁড়া পাতা, টুং-টাং বাজে তার হাতের চুড়ি, খানিক পরে ছাখো টেবিলটির ফিটফাট ভদ্র চেহারা! কিন্তু তার ঐ নিরীহদর্শন শান্তস্বভাব স্বামীটি কী ক'রে যে দু'চার ঘণ্টার মধ্যে এমন নিঃশব্দ বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। সুকুমার টেবিলে গিয়ে বসবার সঙ্গে-সঙ্গে তার চারদিকে যেন আবর্জনা গজিয়ে উঠতে থাকে: পরিচ্ছন্নভাবে কাজ-কর্ম করা তার ধাতে নেই।

এদিকে মায়ার কাজ যে ডবল ছাড়িয়ে চার ডবলে গিয়ে ঠেকে, তার হিসেব কে রাখে। বাবু হয়তো একটি লেখা শেষ ক'রে সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে চ'লে গেলেন, দাসীটি লেগে গেলো কাজে। আরে রামো! বত্রিশ বছরের মানুষের এই কাণ্ড নাকি! বইটি যেখান থেকে নামানো হ'লো, সেখানে আবার তুলে রাখলেই হয়। লেখার কাগজগুলো জড়ো ক'রে একপাশে সরিয়ে রাখলেই হয়। আর সিগারেটের ছাই! সারা টেবিলটিই একটি ছাইয়ের আস্তানা! কী ক'রে একজন মানুষ ওখানে ব'সে কবিতা লেখে গল্প লেখে!

আর তাও মুস্কিল ছাখো, এক চিলতে কাগজও ফেলবার জো নেই। সাহিত্যিক মানুষের কোন্‌টা কাজে লাগে কে জানে। মায়া চিঠিগুলো সব গুছিয়ে রাখে, বইগুলো সরিয়ে রাখে, লেখবার প্যাডগুলো পর-পর সাজিয়ে রাখে—খাম ছুরি কাঁচি আলপিন পেনসিল সব রাখে হাতের কাছে ঠিক ক'রে। কিন্তু ছাখো কাণ্ড! বাজে কাগজের ঝুড়ি থেকে বেরুলো ডিক্‌শনারি। নাঃ!

'কী অসম্ভব নোংরা মানুষ তুমি!' মায়া ব'লে উঠলো। 'আর পারিনে তোমাকে নিয়ে।'

দেয়ালে পেরেক পুঁতে একটি আয়না টাঙানো, তার সামনে দাঁড়িয়ে সুকুমার এক-মনে দাড়ি কামাচ্ছিলো। এইবার বললে, 'এই নিয়ে তিনবার বললে কথাটা।'

'তিনবার! কত হাজারবার বলতে হয় তার কি ইয়ত্তা আছে! তবু যদি তোমার স্বভাবটা একটু শোধরাতো!'

সুকুমার হেসে বললে, 'তুমি প্রশ্রয় দাও ব'লেই বোধ হয় দিন-দিন আরো অগোছাল হ'য়ে যাচ্ছি।'

'থাক্ থাক্, আর মন ভেজাতে হবে না। অগোছাল সইতে পারিনে

ব'লে তোমার টেবিলের পেছনে এই তাড়না করি। নয়তো ব'য়ে গেছ্‌ল আমার! তুমি তো জঞ্জালে ডুবে থাকতেই ভালোবাসো। তোমাকে আমার এই শোবার ঘর থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচতাম।'

'দয়া ক'রে যদি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দাও বড়ো বাধিত হই।'

মায়া দড়াম ক'রে একটা দেরাজ টেনে তার ভিতরে হালের চিঠিপত্র-গুলো ঢুকিয়ে দিলে। দেরাজটি আকণ্ঠ ঠাসা। দিনে-দিনে কত রকমের কাগজপত্র যে জমে ওঠে! তার মধ্যে অ-দরকারিও হয়তো অনেক আছে, বেছে-বেছে সেগুলো ফেলে দিলে তবু একটু জায়গা হয়। কিন্তু এ-কাজ সুকুমার ছাড়া কে করবে! হতচ্ছাড়া চেহারার কতগুলো বাজে কাগজ, যা দেখলেই ফেলে দিতে ইচ্ছে করে, তা হয়তো শ্রীযুক্ত সাহিত্যিকের একটি প্রবন্ধের মাল-মশলা। একটু কিছু যদি হারালো, তবে কি আর রক্ষে আছে। এদিকে নিজে তো প্রতি মুহূর্তেই জিনিস হারাচ্ছে, চীৎকারে হাঁক-ডাকে বাড়ি সরগরম। যে-বইয়ের কথা মনে হ'লো, সেটাই খুঁজে পাওয়া যাবে না, ঠিক সেই চিঠিটিই অন্তর্হিত যেটার তক্ষুনি দরকার। উঃ, কাগজপত্র নিয়েই যার কারবার তার কি এমন হ'লে চলে!

'ঘর আর নেই ব'লে বুঝি ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ডিক্‌শনারি ফেলতে হয়।' মায়া ততক্ষণে বইখানা তুলে নিয়ে ঝেড়ে-মুছে রেখেছে।

'ও নিশ্চয়ই তোমার মেয়ের কাণ্ড!'

'হ্যাঁ, মেয়ে হয়ে ভারি সুবিধে হয়েছে তোমার। সবই ওর ঘাড়ে চাপাতে পারো। সেদিন নাবার ঘরে ইএট্‌স-এর কবিতার বইখানাও কি শীলা ফেলে এসেছিলো? বাড়ি তো মাথায় ক'রে তুলেছিলে—ভাগ্যিস আমি তক্ষুনি বাথরুমে গিয়ে পড়েছিলুম—'

সুকুমার এবার আর কোনো কথা বললে না। হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল অভিধানের ঐ অধঃপতনের জন্য সে-ই দায়ী।

'তুমি একাই তো সাত-শো শিশুর সমান!' বইয়ের শেল্‌ফগুলো গোছাতে-গোছাতে মায়া বললে, 'ভাগ্যিস্ শীলা কক্ষনো তোমার টেবিলে হাত দেয় না, নয়তো ওকে অ্যাদ্দিনে মেরেই ফেলতে। ঐটুকু তো মেয়ে—ঠিক বুঝে নিয়েছে বাপের চরিত্র!'

'মানব-চরিত্র সম্বন্ধে বাপের অন্তর্দৃষ্টিই পেয়েছে আরকি', বিকট-রকমের শক্ত গোঁফের উপর উল্টো ক্ষুর চালাতে-চালাতে মন্তব্য করলে সুকুমার।

'হয়েছে! আর দেমাকে কাজ নেই! তুমি যে কেমন মানুষ তা এই অভাগিনীই শুধু জানে।—এ কী! এ-বইগুলো আবার কোত্থেকে এলো?'

সুকুমার একটু কুণ্ঠিতভাবেই বললে, 'পড়তে এনেছি।'

'নিজেদের বই রাখবার জায়গা নেই, আবার অন্যের বই এনে জড়ো করা কেন? ঐ সুবোধবাবুর বই বুঝি সব? তা ওর আগের বইগুলো ফিরিয়ে দিয়েছো?'

সুকুমার আরো বেশি কুণ্ঠিতভাবে বললে, 'এই এবারেই দেবো।'

'কেন বাপু, পুরোনোগুলো ফিরিয়ে দিয়ে নতুন বই আনলেই তো জায়গার এত টানাটানি হয় না। আর ঐ ভদ্রলোকই বা কেমন, বই কেবল ধার দিয়েই যাচ্ছেন, ফেরৎ নেবার নাম নেই।

'শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিতরণই সুবোধবাবুর জীবনের ব্রত কিনা।'

কিন্তু সুকুমারের রসিকতার চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। শেল্‌ফের উপর বইগুলো যথাসাধ্য আঁটো ক'রে ঠেসে তার উপর অতিরিক্তগুলো শুইয়ে রাখতে-রাখতে মায়া বল্‌লে, 'এ বাড়িতে কি মানুষ থাকবার জায়গা আছে। বইয়ের স্তূপ। মেয়েটার তো কয়েদখানায় থাকতে-থাকতে প্রাণ গেলো। একটু ন'ড়ে বসবার জায়গা নেই—তার উপর কখনো একটু কান্নাকাটি করলে কি আর রক্ষে আছে। তবু ভাগ্যিস বাড়ির কাছে পার্কটা ছিলো।'

'তাহ'লে তুমি কী বলো ? বইগুলো সব ফেলে দেবো ?'

'আহা—ফেলে দেবে কেন ? গুছিয়ে রাখবে। তা এ কথাও না-ব'লে পারিনে যে এই বইয়ের ঝকমারি আমাদের পোষায় না। এ সব বড়োলোকের ব্যাপার।'

'দুঃখের বিষয়, বই পড়বার সখ কি বুদ্ধি ব্যাঙ্কের খাতার শাসন মেনে চলে না।'

মায়া চকিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,'ওঃ, বাবু আবার রাগ করেছেন এর মধ্যে। নাও, এবার সব গুছিয়ে দিয়েছি। তোমার দুদিকে দুটো অ্যাশ-ট্রে থাকলো, দয়া ক'রে টেবিলের উপর ছাই ফেলো না। সত্যি, লেখাপড়াই যার কাজ, তার কি একটা আলাদা ঘর না হ'লে চলে!'

সুকুমার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলে টেবিল ঝক্‌ঝক্ করছে, বইগুলো সারি-সারি সাজানো—ভালোই লাগে দেখতে। আজকের সকালবেলাটাও বেশ। গতরাত্রে যে-গল্পটা অস্পষ্টভাবে একটুখানি ভেবেছিলো, হঠাৎ এক দমক দক্ষিণে হাওয়ার ঝলকে তা যেন তার মনের মধ্যে গ'ড়ে উঠলো। দাড়ি কামানো শেষ ক'রে সে তার চেয়ারে এসে বসলে।—'এবার আমাকে একটু চা ক'রে এনে দাও, তারপরেই তোমার ছুটি।'

'অর্থাৎ—তারপরে আমাকে আর বিরক্ত কোরো না, শান্তিতে ব'সে লিখতে দাও, এই তো ?' মায়া এক টুকরো ন্যাকড়া নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা পরিষ্কার করতে লেগে গেলো। সকাল থেকেই তার হাত দুটি ব্যস্ত।

ড্রেসিং টেবিলের উপরেও দু'খানা বই। বই দুটি তুলে যথাস্থানে রাখতে-রাখতে মায়া বললে, 'ন্যাখো, বইয়ের আর-একটা আলমারি না হ'লে আর চলে না।'

সুকুমার বললে, 'না হ'লে চলে না তো কত জিনিসই। আবার চলেও।'

'না—সত্যি এবার একটা আলমারি কেনবার চেষ্টা করো।'

'আলমারি কেনাটা এভারেস্ট চড়া নয়, কয়েকটা টাকা হ'লেই তার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না।'

'নাঃ, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আমিই মিস্ত্রি ডাকিয়ে করিয়ে নেব।'

'করিয়ে তো নেবে, রাখবে কোথায়?'

'ওঃ, সে একটা ব্যবস্থা হবেই।

মায়া বললে বটে কথাটা, কিন্তু সত্যি তাদের এই আড়াইখানা ঘরের মধ্যে আর-একটা আলমারি রাখবার জায়গা পাওয়া শক্ত। ছোট্ট বসবার ঘরটি দুটি বইয়ের আলমারিতে রুদ্ধশ্বাস, শোবার ঘরে বই, খাবার ঘরে বাসন-কোসনের সঙ্গে-সঙ্গে একরাশ পুরোনো বই—সে-সব বিশেষ কাজেও লাগে না, ফেলতেও মায়া হয়—এমন কি কয়লার খুপরিতেও খবরের কাগজ আর বাজে সাপ্তাহিকের ভিড়, কাগজওলা এলেই বেচে দেয়া হবে। কতদিন এমন হয় যে মেঝেতেই কত ভালো-ভালো বই গড়ায়, রাস্তার দিকে সরু বারান্দার এক কোণ জুড়ে আছে শীলার পেরাম্বুলেটর, শীলা এখন বড়ো হ'য়ে গেছে, গাড়িটা হয়েছে বইয়ের বিছানা। সমস্ত বাড়িটা বইয়ের চাপে এই ফাটে কি সেই ফাটে। এ-বাড়িতে আর সব জিনিসেরই টানাটানি, শুধু পঠনীয় বস্তুর অজস্র সচ্ছলতায় দুটি অধিবাসীর এক-এক সময় যেন হাঁফ ধ'রে যায়। 'বাজে বইগুলো পুরোনো বইয়ের দোকানে বেচে দিলে হয়', বললে সুকুমার। 'কিংবা সের-দরে—কী বলো?'

'আমি ম'রে গেলে সর্বস্ব বেচে দিয়ো, পুড়িয়ে ফেলো, যা খুসি কোরো', মায়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, 'আমি যদ্দিন আছি ও-সব চলবে না। এ-সব অলক্ষ্মীপনা আমার ধাতে নেই।'

এমন একটা সাংঘাতিক জবাবের জন্য সুকুমার প্রস্তুত ছিলো না।

একটা প্যাড হাতের কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'বইগুলো নিয়ে তুমিই বিরক্ত হও, তাই বলি। আর সত্যিই তো, এ-সব রাবিশ জড়ো ক'রে রেখে লাভ কী?'

'লাভ আছে বইকি, শীলা বড়ো হ'য়ে পড়বে।'

'বেশ তাহ'লে,' ব'লে সুকুমার প্যাডের ফিকে নীল কাগজের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন ওখানে অদৃশ্য অক্ষরে কিছু লেখা আছে, সে কলম বুলোলেই তা ফুটে উঠবে। একটু পরে আবার বললে, 'ছেলেবেলা থেকে যত বই কিনেছিলুম ভাগ্যিস তার আদ্ধেকের বেশিই হারিয়ে গেছে। সব থাকলে কী অবস্থা হ'তো ভাবতে ভয় করে।'

'কী আবার হ'তো। থাকতো। কাজে লাগতো। আরে আমি বিয়ের পরে এসে যত বই দেখেছি তা-ই-কি সব আছে নাকি?'

'আপদ গেছে।'

'জিনিসের যত্ন নিতে মোটে জানো না, সে-কথা বললেই হয়! বুদ্ধি থাকলে এই ছোটো বাড়িতেও হাজার-হাজার বইয়ের জায়গা করা যায়।'

প্রথমে সে যা বলেছিলো, শেষ পর্যন্ত মায়া নিজেই সে-কথার প্রতিবাদ করলে। কিন্তু কথাটা যে ফাঁকা বুলি মাত্র, মায়া তা জানে। তাই বোধ হয় সেটা চাপা দেবার জন্যই সে তাড়াতাড়ি বললে, 'যাই তোমার চা ক'রে আনিগে।'

সত্যি, লেখাপড়া করাই যার কাজ, আলাদা একটা ঘর না হ'লে তার কি চলে! জলের কেৎলি চাপিয়ে উনুনের ধারে ব'সে-ব'সে মায়া ভাবলে যে, হোক বেহালা, হোক্ যাদবপুর যেখানে অল্প ভাড়ায় আস্ত একটি বাড়ি পাওয়া যায় সেখানেই তাদের যাওয়া উচিত। খোলা বাড়িতে ছুটোছুটি করতে পারলে মেয়েটাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। অদ্ভুত পছন্দ সুকুমারের—শহরের হট্টগোলের মধ্যে এই ফ্ল্যাটের খুপরিই নাকি তার ভালো লাগে।

চায়ে গরম জল ঢেলে সে অপেক্ষা করছে, এমন সময় স্বামীর উচ্চস্বর ফুটো দেয়াল ভেদ ক'রে তার কানে এসে পৌঁছলো, 'মায়া! মায়া!'

মায়া জবাব দিলে না, একেবারে চা তৈরি ক'রে নিয়েই গিয়ে হাজির হ'লো। দেখা গেলো, সুকুমার টেবিলের এখানে-ওখানে পাগলের মতো হাৎড়াচ্ছে।

—'আমার কলমের ড্রপারটা কোথায় জানো?'

—'কী যেন, আমি তো দেখিনি।'

'গ্যাখোনি তো এতক্ষণ করলে কী? উঃ, কী মুস্কিল, লিখবো ব'লে সব ঠিকঠাক, এখন কিনা কলমে কালি নেই!'

'আর-একটা কলমে লেখো না।'

'না, না, এ-কলম ছাড়া আমার লেখা হয় না।' যে-দেরাজ মায়া এইমাত্র গুছিয়ে পরিষ্কার করলে, তাকে সুকুমার মুহূর্তে একটি কাগজের উন্মাদ আবর্তে পরিণত ক'রে বললে, 'উঃ, জিনিস খুঁজে-খুঁজে যত সময় আমার নষ্ট হয়, তা একত্র করলে অনায়াসে গোটা তিনচার মহাকাব্য লিখতে পারতাম।'

অথচ সেই দেরাজ থেকেই ড্রপার বেরুলো, মায়া যখন তাতে হাত দিলে। সুকুমার নির্লজ্জের মতো বললে, 'কোথায় কোন জিনিস ঢুকিয়ে রাখো, খুঁজে পাবার কি জো আছে

মায়া সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে, 'এত বেলা হ'লো, মেয়েটাকে এখনো নিয়ে আসে না কেন পার্ক থেকে?'

সুকুমার তাড়াতাড়ি বললে, 'থাক্ না, পার্কেই তো ভালো থাকে।'

'ও পার্কে থাকলে তুমি ভালো থাকো, সে-কথা বললেই পারো! আমি তো বলি বিয়ে না-করাই তোমার উচিত ছিলো।'

'তা ঠিক। গরিবের আবার বিয়ে করবার সখ কেন?'

'গরিব-বড়লোকের কথা নয়, যার যেমন স্বভাব। ধৈর্য ব'লে কিছু আছে নাকি তোমার!'

'যথেষ্ট বড়ো বাড়িতে থাকলে তোমারও আমার স্বভাবটা এত অসহ্য লাগতো না।'

মায়া গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললে, 'ছোটো বাড়িতে থাকি ব'লে আমি পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদছি কিনা! ও-সব বিষয়ে তুমিই সচেতন, তাই তোমার দুঃখেরও শেষ নেই।'

সুকুমার বললে, 'সে-কথা ঠিক। কিন্তু সকলেই সচেতন হ'লে পৃথিবীর চেহারাই বদ্‌লে যেতো।'

মায়া কথাটা হয় শুনলে না, নয় গ্রাহ্য করলে না, জামাকাপড় সংগ্রহ ক'রে বাথরুমে চ'লে গেলো নাইতে।

স্নান শেষ ক'রে মায়া যখন বেরুলো, তখন তার স্বাভাবিক ভালো মেজাজ ফিরে এসেছে। মৃদুস্বরে গুনগুন করতে-করতে সে ড্রেসিং টেবিলে গিয়ে বসলো প্রসাধন করতে। দক্ষিণের জানলার কোণে টেবিলটি, আলোয় ঝকঝকে আয়নার সামনে ব'সে সত্যি তার মনটা ভারি ভালো লাগছিলো। তখন চৈত্র মাস। ঝলকে-ঝলকে হাওয়া এসে লাগছে গায়ে, যেন তার মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়ে দিচ্ছে।

কপালে সিঁদুর পরতে-পরতে মায়া বললে, 'ভাগ্যিস পাশেই সিঙ্গিদের বাড়িটা ছিলো। নয়তো কলকাতায় আবার এতখানি দক্ষিণ খোলা!'

'হ্যাঁ, জগতে বড়োলোক থাকবার দু'একটা সুবিধেও আছে বইকি', লেখার কাগজ থেকে মুখ না-তুলেই বললে সুকুমার।

ঠাট্টার ঢঙেই বললে কথাটা, কিন্তু সুবিধেটা যে মস্ত, সে-কথা অস্বীকার করবারও উপায় নেই। তাদের পাশেই এক জমিদারের প্রাসাদের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড; নিজেদের বিপুল বিত্তের বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে প্রতিবেশীর

দক্ষিণ দিকটাও অনেকখানি খুলে না দিয়ে ওরা পারেনি। কাজেই সুকুমারের এই বাসস্থান যদিও আয়তনে ক্ষুদ্র ও তাতে অসুবিধেও অনেক, তবু আলো-হাওয়ার ছড়াছড়িটা অনেক সময় বাড়াবাড়িই মনে হয়। এ সময়টায় এক-একদিন এত হাওয়া দেয় যে, সুকুমার বাধ্য হয় দক্ষিণের তুটো জানলার একটা বন্ধ ক'রে দিতে, নয়তো টেবিলের কাগজ-পত্র সব উড়ে যায়।

প্রসাধন শেষ ক'রে মায়া উঠে তারই একটি জানলার কাছে দাঁড়ালো। খুব বড়োদরেরই জমিদার এঁরা, বাড়ির চুড়োয় একটি ঘড়িও আছে। তাতে অবশ্য মায়ার ভারি সুবিধে হয়েছে, কেননা, তাদের বাড়িতে একটির বেশি ঘড়ি নেই। সবুজ ঘাসে মোড়া প্রকাণ্ড লনে মালিরা হোস্‌পাইপে জল দিচ্ছে। মাঝখানে একটি ফোয়ারা আর ফুলের বাগান, তার তুদিক দিয়ে বেঁকিয়ে লাল সুরকির রাস্তা গোল হ'য়ে গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে মিশেছে। একপাশে জালের বেড়া দেয়া অনেকটা জায়গা লম্বা হ'য়ে চ'লে গেছে, মায়া শুনেছে—সেখানে জমিদারের সখের পশুশালা। হরিণ আছে, ময়ূর আছে, নানারকমের হাঁস আছে, পোষা একটা চিতাবাঘও আছে নাকি। মায়ার বড়ো ইচ্ছে করে একদিন গিয়ে সে-সব দেখে আসে। সন্ধ্যাবেলায় যখন অনেকগুলো হাঁস একসঙ্গে ডেকে ওঠে, তখন সে-শব্দ শুনে তার মনটা যে কেমন করে।

'চলো না একদিন ওদের পশুশালাটা দেখে আসি', মায়া না-ব'লে পারলে না।

সুকুমার লিখতে ব্যস্ত ছিলো, কোনো জবাব দিলে না।

মায়া জানলা থেকে স'রে এসে স্বামীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলো না একদিন।'

সুকুমার অন্যমনস্কভাবে বললে, 'কোথায় ?'

'ওদের পশু-শালা দেখতে। যাবে?'

'কাদের? ঐ সিঙ্গিদের? থাক্ থাক্, বড়োলোকের সঙ্গে আর ভাব করতে গিয়ে লাভ নেই, বিনি পয়সায় হাওয়া খাচ্ছো, এই যথেষ্ট।'

মায়া স্বামীর মুখের দিকে চুপ ক'রে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোমার হয়েছে কী বলো তো? কে গরিব আর কে বড়োলোক এ-কথা কি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারো না? নিজেকে যে বড়ো গরিব-গরিব ব'লে বেড়াও, তোমার চেয়ে গরিব কত আছে, তা কি ভাবো? আমাদের গলির মোড়ের ঐ বস্তিটায় যারা থাকে—'

'—ওরা আছে ব'লেই তো ঐ সিঙ্গিমশাই আছেন। ওদের থাকা দরকার', ব'লে সুকুমার হঠাৎ হেসে উঠলো।

মায়া স্বামীর এই আকস্মিক হাসিকে মোটেও গায়ে না-মেখে বললে, 'জানো, ওদের হরিণ আছে, ময়ূর আছে, চিতাবাঘ আছে। ভালোবাসো না তুমি ময়ূর দেখতে, হরিণ দেখতে?'

'ভালোবাসার সময় কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে সুকুমার।

সুকুমার গল্প লেখায় ব্যস্ত, তখন আর এ-বিষয়ে কোনো কথা হ'লো না। কিন্তু সে যেমন মানুষ, তাকে নিয়ে যে জমিদারবাড়ির চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া যাবে না, সে-বিষয়ে মায়ার সন্দেহ রইলো না। এদিকে কথাটা তার মনে ক'দিন থেকেই ঘোরাফেরা করছে। চিতাবাঘটা না জানি কত বড়ো! আর হরিণ—আহা, এত সুন্দর জীব আর আছে নাকি জগতে। যদি কখনো তার বাড়িতে একটুও ঘাসের জমি থাকে, তাহ'লে, আর যা-ই হোক্, একটা হরিণ সে পুষবেই।

পরদিন দুপুরবেলায় নানা কাজে নানা জায়গায় ঘুরে বেলা তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরে সুকুমার দেখলে, বাড়িতে কেউ নেই। চাকর খবর দিলে মা মামাবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেছেন, শীলাও গেছে সঙ্গে। মামাবাবুটি নিশ্চয়ই

নরেন, মায়ার খুড়তুতো ভাই, কলেজ পালিয়ে প্রায়ই এ-বাড়িতে তার আড্ডা। এই রোদ্দুরে কোথায় আবার বেরুলো ওরা!

একটা গল্পের বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে সুকুমারের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো, এমন সময় ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দে সে চোখ খুললো। মায়াকে দেখে বললে, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

চাপা হাসিতে গাল লাল ক'রে মায়া বললে, 'তুমি কখন ফিরলে?'

'এই তো এইমাত্র।'

'আমি আগেই বলেছিলুম, দিদি!' নরেন মায়ার চোখের দিকে তাকাতেই দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

জুতো খুলে রেখে খাটের একপাশে ব'সে মায়া বললে, 'আমি তো উঠি-উঠি করছি কখন থেকেই। ভদ্রমহিলা একটু মিষ্টি না-খাইয়ে ছাড়লেন না।'

এমন সময় শীলা বিছানার উপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে বাপের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'জানো বাবা, ওদের বাড়িতে বাঘ আছে, হরিণ আছে, ময়ূর আছে—আর কী কী আছে বলো তো?'

'ওঃ, তাহ'লে তোমরা জমিদারের চিড়িয়াখানা দেখে এসেছো!'

নরেন ব'লে উঠলো, 'বা-বাঃ! দিদির যা সখ! আমি যেতে চাইনি, আমাকে জোর কোরেই—'

'নে, চুপ কর', বলে উঠলো মায়া। 'তোর আর ফাজলেমি করতে হবে না। কেমন দেখিয়ে আনলাম চিড়িয়াখানা, আবার মিষ্টিও খেয়ে এলি। ক'টা সন্দেশ খেয়েছিলি রে?'

নরেন চাপা হেসে বললে, 'খুব ভালো ছিলো সন্দেশগুলো। রেফ্রিজরেটরে-রাখা মিষ্টি খেতে ভারি আরাম।'

'তা চিড়িয়াখানা কেমন দেখলে?' জিজ্ঞেস করলে সুকুমার।

'চমৎকার !' মায়া উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। 'মস্ত জায়গা নিয়ে এক এলাহি কাণ্ড—আমাদের বাড়ি থেকে ওদিকটা চোখে পড়ে না। পাখিই কত রকমের! বক, সারস, রাজহাঁস—রাজহাঁসদের জন্য আবার একটা পুকুর, কী যে সুন্দর ওরা, হ্যান্স অ্যাণ্ডারসেনের সেই গল্প মনে পড়ে। পুকুরের ধারে গাছের ছায়ায় হরিণ—সত্যি, কী চোখ হরিণের! আবার ময়ূরদের জন্যে আলাদা জায়গা—'

'আর বাঘ, মা, বাঘ—' মায়া দম নেবার জন্য একটু থামতেই শীলা ব'লে উঠলো।

'চিতাবাঘটা কিন্তু তেমন কিছু নয়। খুব বড়ো একটা বেড়ালের মতো দেখতে—না রে, নরেন? তবে মুখখানাতে ঢের বেশি লাবণ্য—'

হো-হো ক'রে হেসে উঠে নরেন বললে, 'বাঘের মুখে লাবণ্য!'

'হ্যাঁ, সত্যি। তবে বাঘটা একটা জালের খাঁচায় পোরা—ভালো ক'রে দেখাই যায় না। কেবল তো শুয়েই থাকতে দেখলুম—আহা, ঐটুকু জায়গায় থাকতে কষ্ট হয় না ওর! আগে নাকি জমিদারবাবু ওর গলায় শেকল বেঁধে বেড়াতেন, রাস্তায় কাকে বুঝি একদিন তাড়া করে—তারপর পুলিশ থেকে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। এখন দিনরাত ও বন্দী।' শেষের কথাটা মায়া বেশ একটু দুঃখের সুরেই বললে। 'শুধু শনিবার বিকেলে ওকে একবার বার ক'রে ওখানেই খানিক ঘুরিয়ে আনা হয়। যে-লোকটা ওর দেখাশোনা করে সে আমাকে বললে, সেদিন গেলে ওকে খুব ভালো ক'রে দেখা যায়। বাঘটা নাকি ভারি শান্ত, মোটে হাঁকডাক নেই, গায়ে হাত দিলেও কিছু বলে না।'

সুকুমার বললে, 'তুমি তাহ'লে পশু ও মানুষ সকলের সঙ্গেই ভাব ক'রে এসেছো?'

মায়া বললে, 'ঐ লোকগুলো ভারি ভদ্র। নরেন তো প্রথমে যেতেই

চায় না, গিয়ে খুসি হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করো। বলে, "চেনা নেই, কিছু নেই, হুট ক'রে গিয়ে পরের বাড়িতে উঠতে পারবো না।" আমি বললুম "কী মুস্কিল! আমরা তো আর ওদের বাড়ি চড়াও করছি না, পশু-শালা দেখতে যাচ্ছি; বাড়িতে জীব-জন্তু থাকলে অমন দু'চারজন লোক আসেই দেখতে।' আমিই নিয়ে গেলুম নরেনকে। গেটে ইয়া গোঁফওলা দরোয়ান ব'সে। আমি তাকে বললুম, 'এ বাড়িতে সব বাঘ-টাগ আছে শুনেছি, সে-সব দেখা যায় না!' লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ক'রে বললে, 'হাঁ, আইয়ে মাইজি।' আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এলো সে-জায়গায়, তারপর সেখানে অন্য লোকেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালো আমাদের। লোকগুলো ভারি ভালো, সত্যি।'

সুকুমার বললে, 'এমনি আমাদের স্বভাব যে বড়োলোকের চাকর একটু হেসে কথা বললেও আমরা গ'লে যাই।'

মায়া চ'টে উঠে বললে, 'ছাখো, সব সময় বাড়াবাড়ি কোরো না, ব'লে দিচ্ছি। তোমার কাছে কি ভালো লোক মন্দ লোক ব'লে কিচ্ছু নেই, শুধু গরিব আর বড়োলোক আছে?'

'বড়োলোকের পক্ষে ভালো হওয়া খুব সোজা—এই আরকি। তাছাড়া, বড়োলোক অতি সাধারণ একটু ভদ্রতা করলেও আমরা ভাবি—ওহো কী চমৎকার মানুষ, একেবারে দেমাক নেই!'

'তাহ'লে তুমি কি বলো জগতে বড়োলোক ব'লে কিছু থাকবেই না?'

'আমার ইচ্ছে-মতোই তো সব হচ্ছে না—সুতরাং আমি কী ভাবি না ভাবি তা ব'লে লাভ কী?'

'কিন্তু বড়োলোক না-থাকলেই বা চলবে কেমন ক'রে? ধরো ঐ ভদ্রলোক যে এত সব সুন্দর-সুন্দর জানোয়ার পুষতে পারছেন তা তাঁর অগাধ পয়সা আছে ব'লেই তো?'

'তা তো ঠিকই। তবে কিনা ঐ জমিদাররূপ জানোয়ারকে কারা পুষছে, সেটাও দেখতে হয়।'

'নাঃ', মায়া মাথা ঝেঁকে বললে, 'তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। সুন্দর জিনিস যার সুন্দর লাগে না, সে আবার মানুষ কী? তোমার ভাবখানা এই যে, কোনো-কোনো মানুষ যে সুন্দর জিনিস ভালোবাসে, সেটা যেন মস্ত অপরাধ। যাওঃ—তোমার সঙ্গে আমি আর কথাই বলবো না।' মুখ লাল ক'রে মায়া চুপ ক'রে গেলো।

'কী আশ্চর্য! সত্যি-সত্যি রাগ করলে নাকি? আরে সুন্দর জিনিস সকলেই যে ভালোবাসে। আমিও যে ভালোবাসি তার প্রমাণ তো তুমিই। কী বলো হে, নরেন?'

মায়া আরো বেশি লাল হ'য়ে উঠে বললে, 'কী অসভ্য!'

'রাগ যদি প'ড়ে থাকে, দয়া ক'রে এখন চায়ের ব্যবস্থা করো।'

'চা খেতে-খেতে সুকুমার এ-কাহিনীর শেষাংশ শুনলে। পশু-পাখি দেখা শেষ ক'রে মায়ারা ফিরে আসছে, এমন সময় একজন ঝি বাড়ির ভিতর থেকে এসে বললে যে, রানি-মা তাঁদের একটু ভিতরে যেতে বলছেন। তারা যেতে চায়নি, কিন্তু ঝি এমন পিড়াপিড়ি করতে লাগলো যে, শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারলে না। একতলার সিঁড়ির উপরে রানি নিজেই দাঁড়িয়ে, বয়েস বেশি নয়, অপূর্ব সুন্দরী। তিনি তাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন, অনেক আলাপ করলেন, না খাইয়ে ছাড়লেন না। বললেন, "পশু দেখেই ফিরে যাচ্ছিলেন, এ-বাড়িতে মানুষও যে আছে, তা বুঝি মনে করতে নেই? সারাটা দিন আমার ভারি একা কাটে, আপনি যদি মাঝে-মাঝে আসেন, বড়ো খুসি হই।"'

'কেন. একা কাটে কেন?' জিজ্ঞেস করলে সুকুমার।

'কোনো তো কাজ নেই, হাঁপিয়ে ওঠে বোধ হয়। একেবারে কাজ

না-থাকাও ভালো না, মানুষ বাঁচে কী নিয়ে? এত উপকরণ, তবু নাকি সময় কাটে না! পুকুরধারে সেই গাছের ছায়াটি কী সুন্দর, তা ও-বাড়ির চাকরবাকর ছাড়া আর কেউ বোধ হয় বছরে একবারও সেখানে যায় না। আমি হ'লে তো রোজ দুপুরে সেখানেই ব'সে থাকতুম।'

'তুমি যদি জমিদারগিন্নি হ'তে তাহ'লে তোমার মতটা হয়তো অন্যরকম হ'তো।'

'ত্যাখো, এটা মতামতের কথা নয়, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা। বেশি পয়সা হলে মানুষগুলো কেমন যেন ম'রে যায়, প্রাণে কোনো ইচ্ছাই থাকে না।'

সুকুমার হেসে বললে, 'অসংখ্য অপূর্ণ ইচ্ছা নিয়ে আমাদেরই তবে চরম বেঁচে থাকা—কী বলো?'

সে-রাত্রে বিছানায় শুয়ে মায়া হঠাৎ বললে, 'তুমি কুকুর ভালোবাসো?'

সুকুমার বললে, 'কী যেন, ভেবে দেখিনি।'

'জানো, ও-বাড়ির গিন্নি আজ কী বললেন? রাজাবাবুর কুকুরের সখ হয়েছে, বিলেতে দুশো জোড়া ভালো-ভালো কুকুরের অর্ডার গেছে, পঞ্চাশ হাজার টাকা নাকি খরচ পড়বে। সত্যি নাকি কুকুরের অত দাম?'

—'তা হ'তে পারে।'

'তা আরো বলে কী জানো—বাড়িতে মোটে জায়গা নেই, কুকুরগুলো এলে মুস্কিলই হবে। শুনছো, অত বড়ো বাড়িতেও নাকি জায়গা নেই!'

'এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে!'

'যত সব আজগুবি কাণ্ড! জানো, ওদের একতলার যে-ঘরটায় আমরা বসেছিলাম, সেদিককার ফালিটুকু শুধু যদি আমাদের ছেড়ে দেয়, তবে আমরা দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি।'

'সে-কথা আর ব'লে লাভ কী ?'

'আচ্ছা, ক'জনই বা লোক ওরা, অতগুলো ঘর দিয়ে করে কী বলতে পারো ?'

'সাজিয়ে রাখে।'

'উঁ ?' মায়া কথাটা বুঝতে পারলে না।

'প্রত্যেকটা ঘর সাজিয়ে রেখে দেয়, এই আরকি। আসবাব ধরাবার জন্য ঘর বাড়ে, ঘর বেশি হ'লে নতুন আসবাব আসে।'

মায়া বললে, 'ওঃ, কী অজস্র জিনিস! অথচ কতটুকুই বা ব্যবহারে লাগে!—শোনো, যাবো নাকি শনিবার ছাড়া বাঘ দেখতে ?'

'যেয়ো।'

'তুমি রাগ করবে না তো ?'

'বাঃ, এতে আবার রাগ করবার কী ?'

'কুকুরগুলো এলেও কিন্তু দেখতে যাবো।'

'বেশ তো।'

'তোমার বুঝি কুকুর ভালো লাগে না ?'

'তা বেড়ালের চেয়ে কুকুর অনেক ভালো।'

মায়া তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হ'য়ে বললে, 'ওঃ, কুকুরের মতো জিনিস আর আছে নাকি ? ছাখো, আমি একটা কুকুর পুষবো।

'এইটুকু বাড়িতে আবার কুকুর!'

'আহা—কুকুরের তো আর আলাদা ঘর লাগে না, এর মধ্যেই বেশ হ'য়ে যাবে। দেবে আমাকে একটা কুকুর কিনে ? মার্কেটের কাছে তিন-চার টাকায় সুন্দর-সুন্দর বাচ্চা পাওয়া যায়।'

'দেখবো।'

'তোমার দেখি বড়ো উৎসাহ নেই ? দিন-রাত বাড়ি পাহারা দেবে,

তাছাড়া শীলারও খেলার সঙ্গী হ'তে পারবে—চমৎকার হবে, না? ও-বেচারার তো কোনো সঙ্গী নেই।

'শীলার সঙ্গীর জন্যেই যদি তোমার ভাবনা, তাহ'লে ওকে একটি ভাই কি বোন উপহার দিলেই তো পারো', বললে সুকুমার।

'ইস্—কী অসভ্য তুমি বাস্তবিক!' ব'লে মায়া বালিশে মুখ লুকালো।

কুকুরের কথা মায়া কিন্তু ভুললো না। যখন-তখন স্বামীকে তাগাদা দেয়। লেজ নাড়তে-নাড়তে ছোট্ট একটি জীব তার পায়ের কাছে দাঁড়াবে চকচকে চোখ তুলে খাবার চাইবে—এ-কথা ভাবতেই সুখে তার বুক ভ'রে ওঠে। সে ওকে কাঠের একটা বাক্স ক'রে দেবে, নিজের হাতে সব নোংরা ফেলবে—কারো কোনো অসুবিধে হবে না। সাধারণভাবে কুকুর রাখতে কিছু তো আর খরচ নেই; আর, কোনো বাড়িই এত ছোটো নয় যেখানে একটা কুকুরের জায়গা হয় না।

সুকুমারের কিন্তু মোটে গরজ নেই। সে শুধু বলে, 'কী আর হবে একটা উপসর্গ বাড়িয়ে, নিজেদেরই সংস্থান নেই!' বাজে কথা সব! আসলে, মায়া ভাবে, ওর ইচ্ছেই নেই; কুকুর ও মোটে ভালোই বাসে না। মায়া মনে-মনে ঠিক ক'রে ফেললে, নিজেই একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কুকুর কিনে আনবে।

এর মধ্যে একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে এসে সুকুমার বললে, 'মায়া, তোমার মতো আর একজন কুকুর-পাগল দেখে এলাম।'

'কোথায় দেখলে?'

'আমাদের এই গলির মোড়ের বস্তিতে। কর্পোরেশন থেকে রাস্তার সব কুকুর মেরে ফেলছে, জানো তো—আমাদের গলির একটাকে আজ সাবাড় করেছে।'

'বলো কী! সেই শাদা-কালো মেশানো কুকুরটা নয় তো? আহা!'

'হ্যাঁ, সেটাই। আমি আসি যখন, দেখি ডোমেরা ওকে বাঁশে ঝুলিয়ে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। আর বস্তির একটা মেয়ে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। সে-চ্যাঁচানো কান্নাও বটে, কিন্তু বেশির ভাগই ডোমেদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ। বাস্‌রে, সে কী গালি!'

'আহা!' মায়া অনুকম্পায় উস্থল হ'য়ে উঠলো। 'মেয়েটা কুকুরটাকে পুষতো বুঝি? ঐ ডোমগুলো কী ভয়ানক নিষ্ঠুর—একটা নিরীহ জীবকে মারতে পারলে!'

'রাস্তারই কুকুর, মেয়েটা বোধ হয় খাওয়াতো-টাওয়াতো, হয়তো ওর বাড়িও পাহারা দিতো রাত্রে—কী বলো?'

'তা দিতো না! আহা—কুকুরটাকে আমি যেতে-আসতে কতদিন দেখেছি। ভারি ভালো ছিলো।'

সুকুমার একটু হেসে বললে, 'তোমার কুকুরবিলাসী জমিদারের গিন্নিকে এ-খবরটা দিতে পারো।'

'তিনি তো আজ এসেছিলেন।'

'কে? মিসেস সিঙ্গি?'

মায়া মাথা নেড়ে বললে, 'হঠাৎ দুপুরবেলায় এসে হাজির। আমি তো অবাক।'

'ওঃ, এত সৌভাগ্য তোমার! তা গলার হার খুলে কবিপ্রিয়কে দিয়ে গেলো না?'

'কবিরই নাম শোনেনি তো কবিপ্রিয়া!'

'জানো, আমাদের কয়েকটা নভেল ধার নিয়ে গেছে; বলে, তবু সময় কাটবে।'

'বলো কী! বাংলা সাহিত্যের এত ভাগ্য!'

'আমি জিজ্ঞেস করলুম—"আপনাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই অনেক বই?"

বলে কী জানো—"না ভাই, ওঁর বই-টইয়ের বাতিক নেই, জানোয়ার-টানোয়ারেই সখ। এই তো এখন কুকুর নিয়ে মেতেছেন।"

'আমি বললুম—"তা আপনার জন্যে তো বই-টই—" "হ্যাঁ, দুচারখানা বই হ'লে সময়টা কাটে একরকম। এ ক'টা আমি আজ নিয়ে যাই, কেমন? কয়েকদিন পরেই পাঠিয়ে দেবো।" ভাবতে পারো, সারা বাড়িতে একখানা বোধ হয় বই নেই! আমার কাছ থেকে ধার নিতে লজ্জাও করলো না!'

'ওঃ', সুকুমার হেসে বললে, 'তোমার বিখ্যাত স্বামীর নাম না-শোনাতে খুব চ'টে গেছো দেখছি।'

'বোলো না আর—একেবারে অনকালচার্ড!'

'তা কুকুরগুলো কবে এসে পৌঁচচ্ছে?'

'কী জানি! আমার আর বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করলো না।'

কিন্তু চারশো কুকুর সত্যি-সত্যি একদিন এসে পৌঁছলো।

'জানো তো', মাস দুই বাদে সুকুমার একদিন বললে, 'আমাদের গলির মোড়ের বস্তিটা উঠে গেলো।'

'সত্যি? বাঁচা গেলো তাহ'লে। যা নোংরা ছিলো ঐ মোড়টা।'

'ঐ সমস্তটা জমি সিঙ্গিমশাই কিনে নিলেন। ওখানে তাঁর পঞ্চাশ-হাজারি কুকুরের কেনেল হবে।'

'বলো কী!' মায়া যেন একটু স্তম্ভিতই হ'লো।

'লোকগুলো সব যাবে কোথায়?'

'যাবেই কোনোখানে। আমাদের দিকটায় যে বাড়ি বাড়াবার দরকার হয়নি, সেটুকুও বাঁচোয়া। নয়তো বাড়িওলাকে ডবল দাম দিয়ে কিনে নিতে কতক্ষণ। তাহ'লে আমাদেরও তো আজ আবার বাড়ি খুঁজতে বেরুতে হ'তো।'

কয়েক মাসের মধ্যে গলির চেহারাই বদলে গেলো। বড়ো রাস্তার মোড় থেকেই বিরাট সিংহ-ভবন সুরু, গলির অর্দ্ধেক সে একাই গ্রাস করেছে। গোলমাল, আবর্জনা, পানের পিক, উলঙ্গ শিশু, সব অন্তর্হিত হয়েছে। ট্র্যাম থেকে নেমে স্বামীর সঙ্গে বাড়ির দিকে আসতে-আসতে মায়া একদিন বললে, 'যা-ই বলো, বস্তিগুলো উঠে যাওয়ায় খুব ভালো হয়েছে। এখান দিয়ে আগে হাঁটা যেতো না। হাজার হোক্‌, ছোটোলোক আর ভদ্রলোক কি পাশাপাশি থাকতে পারে!'

সুকুমার বললে, 'তা ঠিক—যতদিন ছোটোলোক আর ভদ্রলোক ব'লে আলাদা দুটো জাত আছে।'

হতাশা

—কী, শুয়ে পড়লে যে বড়ো? আপিসে যাবে না আজ?

—আহা, এই খেয়ে উঠলুম, একটু জিরোতে দাও না। আর-একটা পান দাও।

সুরমা পানের ডিবেটা নিয়ে স্বামীর শিয়রের কাছে রাখলো। অনুপম একটা পান মুখে দিয়ে খবরের কাগজের ছবির পৃষ্ঠাটা চোখের সামনে খুলে ধ'রে বললে—বিলিতি মেয়েগুলা কী অসভ্যই হচ্ছে দিন-দিন! ঐটুকু কাপড় গায়ে না রাখলেই বা কী! দেখেছো?

কিন্তু পাশ ফিরে তাকিয়ে সুরমাকে সেখানে দেখতে পেলো না। কোথায় সে? অনুপম হাঁক দিলে—সুরমা!

সুরমা পাশের ঘর থেকে বললে—যাই। কোন্ জুতোটা পরবে আজ?

—গেছে আবার জুতো বুরুশ করতে! বেশ একটু বিরক্তির সুরেই বললে অনুপম।

একটু পরে সুরমা একজোড়া চকোলেট রঙের জুতো হাতে ক'রে ঢুকলো। ঝকঝক করছে আয়নার মতো। জুতোটা নামিয়ে রেখে বললে—ওঠো এখন।

অনুপম খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালো; কথাটা তার কানে গেছে কিনা বোঝা গেলো না। সুরমা টেবিলের কাছে স'রে এসে বললে—বারোটা বাজে যে।

অনুপম তবু চুপ। এত গভীর মন দিয়ে খবরের কাগজে কী পড়ছে সে-ই জানে। চেয়ারের পিঠের উপর তার পাৎলুন, কোট, নেকটাই সব সাজানো, সেগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে সুরমা আবার বললে—ওঠো না!

এবার অনুপম জবাব দিলে—কী যে বিরক্ত করো! আপিসের বাঁধা কাজ তো নয় যে দশটা বাজতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে।

—কাল তো দশটা না-বাজতেই বাড়ি মাথায় ক'রে তুলেছিলে। একটু ঝাঁঝালো স্বরেই বললে সুরমা। ঝাঁঝের কারণ ছিলো। কাল আপিসে বেরোবার আগে অনুপমের নতুন নেকটাই খুঁজে পাওয়া যায়নি—তাই নিয়ে কী কাণ্ড! সুরমা একাই নয়, তার শাশুড়ি, তার ইস্কুলগামী ছোটো ননদ সকলকেই হাঁকে-ডাকে বিপর্যস্ত ক'রে অনুপম শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলো যে এমন বিশৃঙ্খল বাড়িতে মানুষের বসবাস অসম্ভব। স্বয়ং শ্বশুরমশাই আপিসে বেরোবার মুখে বলেছিলেন—কী বিশ্রী মেজাজ হয়েছে ছেলেটার। তা তোমরাও তো আগে থেকেই ওর কাপড়চোপড়গুলো একটু···

লজ্জায় সুরমা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। স্বামীর তুচ্ছতম সুখ-সুবিধের জন্য সে তো প্রাণপণ করে, তবে মানুষ যদি এমন হয় যে পুরোনো চিঠি-পত্রের দেরাজে নতুন নেকটাই ঢুকিয়ে রেখে তারপর বাড়িশুদ্ধ লোকের উপর মেজাজ ফলিয়ে বেড়ায়···

সেইজন্যে আজ সকালবেলাই সে কাপড়চোপড় সব ঠিক ক'রে রেখেছে, কিন্তু আজ অনুপমের তাড়া নেই। একটু পরে বললে—আজ কি তাহ'লে বেরোবেই না?

অনুপম গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে—উঠছি। কিন্তু তার ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

টেবিলের উপর কয়েকটা জিনিস নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করতে-করতে সুরমা বললে—কাজে এ-রকম গাফিলি করা কি ভালো? মাসের শেষে মাইনে তো ওরাই দেবে!

—ওঃ, তা দিলেই বা। আমাদের তো আর দশটার সময় আপিসে হাজিরা দিতে হয় না। আমাদের হ'লো ফীল্ড-ওঅর্ক। নিজের ইচ্ছে-মতো কাজ।

—তা হোক, বিছানায় শুয়ে থাকলে কোনো কাজই তো চলবে না।

অনুপম হঠাৎ চ'টে উঠে বললে—আমার ইচ্ছে শুয়ে থাকবো। আমার শোয়া বসাও তোমার হুকুমে হবে নাকি?

—আমার হুকুমে হবে কেন? সমস্ত সংসারটাই হুকুমে চলছে। ইচ্ছে-মতো শোয়া বসা কার আছে?

—ওঃ, ভারি তো একশো-পঁচিশ টাকার চাকরি—ছেড়ে দিলেই বা কী?

এবার সুরমার মুখে সত্যি-সত্যি আশঙ্কার ছায়া পড়লো।—বলো কী, এমন ভালো চাকরিটা ছেড়ে দেবে। ভালো ক'রে কাজ তো আরম্ভই করলে না এখনো।

অনুপম যেমন হঠাৎ চ'টে উঠেছিলো, তেমনি হঠাৎ নরম হ'য়ে বললে, না, না, ছাড়বো কী! উঠি এবার। ব'লে সে সত্যি-সত্যি উঠে বসলো।

সুরমা আশ্বস্ত বোধ করলে, তবু না ব'লে পারলে না—ছাখো, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ছেড়ে-টেড়ে দিয়ো না কিন্তু। শ্বশুরমশাই তাহ'লে মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

আর-কোনো কথা সুরমা বলতে পারলে না; তার নিজের দিকটা

মনে এলো না তার, অনুপমের দিকটাও নয়, শ্বশুরের কথাই মনে হ'লো। বয়েসের চাইতে বেশি বুড়ো হয়েছেন। সরকারি চাকরিতে পেন্সন নেবার দু'চার বছর বাকি। দু'চার বছর পরে দেড়শো টাকাতে পেন্সন্ নেবেন—তখন এই বৃহৎ সংসার চলবে কেমন ক'রে? সারাজীবনের সঞ্চয় নিঃশেষ ক'রে টালিগঞ্জে এই ছোটো বাড়িটি করেছেন। তার উপর বিস্তর দেনা। আশ্রিত, অতিথি, নিঃসম্বল আত্মীয়ের অভাব নেই। নিজের পড়ুয়া ছেলে, অবিবাহিত মেয়ে আছে এখনো। অনুপম বড়ো ছেলে। বছর চারেক আগে বি. এ. পাশ করেছে। বিয়ে হয়েছে বছর-খানেক। বিবাহটা মা-বাপের কর্তব্যসম্পাদন। সুরমা খুব সুখে আছে শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর-শাশুড়ি অত্যন্ত স্নেহ করেন। এত স্নেহ করেন ব'লেই শ্বশুরের জন্য তার এত কষ্ট হয়। উপার্জন একজনের, দাবি দশজনের। বুড়ো ভদ্রলোক একটা শার্ট ছিঁড়ে গেলে সহজে আর-একটা কেনেন না। অথচ পুত্রবধূর জন্যে ঘন-ঘন শাড়ি কেনা হচ্ছে—পাছে ছেলের মনে কষ্ট হয়। সুরমার ভারি লজ্জা করে।

অনুপমই একমাত্র আশা। কিন্তু…আজকালকার দিনের সাধারণ বি. এ. পাশ ছেলে, কতটুকু আশা তার, কতটুকু মূল্য? সেরা পাশিয়েরা খাবি খাচ্ছে। তাই ব'লে অনুপমের কোনো উৎকণ্ঠাও নেই। সে দিব্যি খায়-দায় ঘুমোয়, বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়, সিনেমাও ছাখে। এই পরম নিশ্চিন্ত ভাবটা সুরমার ভালো লাগে না। আজকালকার দিনে কি নিজের উপর মমতা করলে চলে! জীবন পণ ক'রে খাটতে হবে…অমনি ক'রেই কিছু হ'য়ে যাবে। কী আর হবে? কতটুকু হবে? যেটুকুই হোক্, বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা হবে তো। তাছাড়া, শুয়ে-ব'সে কি আর পুরুষমানুষের দিন কাটে? না কি সেটা ভালোই দেখায়?

তবে কিছুদিন থেকে অনুপমের ভাবটা যেন বদলেছে। বাড়ি থেকে

সে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায় সাড়ে-দশটা বাজতেই, ফিরে যখন আসে তখন প্রায় সন্ধে। তার রোদে-পোড়া ক্লান্ত মুখ দেখে সুরমার ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু এই তো পুরুষের জীবন···মনে-মনে তার কেমন একটা আনন্দে-মেশা গর্বও হয়। সে নিজে···সে তো দুপুরবেলা ঠাণ্ডা পাটিতে প'ড়ে ঘুমিয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া আর কী করবে সে? সে অতি সাধারণ স্ত্রীলোক···তাকে দিয়ে সংসারের যা-যা কাজ হ'তে পারে, তাতে সে কখনো ত্রুটি করে না। অনুপম ফিরে এসেই চা তৈরি পায়, স্নান করতে যাবার সময় কাপড়ের জন্যে হাৎড়াতে হয় না, বাথ-রুমের আলনায় সব সাজানো আছে। এর বেশি সুরমার সাধ্য নেই, সাবেকি পরিবারের আড়ালে-আবডালে সে মানুষ হয়েছে, বৃহৎ পুরুষ-পৃথিবীর কোনো ব্যাপারই সে জানে না; সে গেঞ্জি কেচে দিয়ে ধোপার খরচ বাঁচাতে পারে, দশবার ঘর ঝাঁট দিয়ে স্বামীর মেজাজ ভালো রাখতে পারে, দিতে পারে জুতো বুরুশ ক'রে, দরকার হ'লে সুখাদ্য রেঁধে খাওয়াতে পারে—এই পর্যন্ত। সুরমার বাপের বাড়ি বড়োলোক নয়, টানাটানির সংসারকে নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রম দিয়েই সুশ্রী ক'রে তুলতে সে তার মাকে দেখেছে। সে-ও কি তা পারবে না?

রাত্রে সে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে—কোথায় থাকো সারাদিন?

অনুপম গম্ভীরভাবে শুধু একটি কথা বলে—কাজ। এর চাইতে মহৎ কথা আজকালকার ভাষায় নেই।

—সুবিধে হচ্ছে কিছু?

—চেষ্টা তো করছি। দেখি কী হয়। অনুপম তার কথায় বেশ একটা রহস্যের ভাব বজায় রাখে, সুরমা আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। আর সত্যি অনুপম যখন পর-পর পাঁচ-সাতদিন সাড়ে-দশটায় বেরিয়ে গিয়ে নিতান্তই ক্লান্ত চেহারা ক'রে সন্ধেবেলা ফিরে আসতে লাগলো, তখন আর

সন্দেহ করবার কোনো উপায় থাকলো না যে সত্যি-সত্যি সে এবার কর্মক্ষেত্রে নেমেছে।

তারপর একদিন সে তার স্ত্রীকে চুপি-চুপি বললে—কাউকে বোলো না এখন, একটা চাকরি পেয়েছি।

—পেয়েছো সত্যি ?

অনুপম একটা ইনশিওরেন্স কোম্পানির নাম করলে। সেখানে, জানা গেলো, তাকে একটা চাকরি নেবার জন্যে সাধাসাধি করছে অনেকদিন থেকে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে বনিবনা হচ্ছিলো না। এবারে রফা হয়েছে—বেশি কিছু নয়, একশো-পঁচিশ দেবে গোড়াতে। ছ' মাস পরে কাজকর্ম দেখে বাড়িয়ে দেবার কথা। তাছাড়া কমিশন। মোটর অ্যালাউএন্স গোটা পঞ্চাশ দিতেও রাজি আছে, তবে গাড়ি তো···

এখানে বাধা দিয়ে সুরমা বলেছিলো—বলো কী! সত্যি ?

অনুপম অবিচলিতভাবে বললে—নেহাৎ মন্দ নয়, কী বলো? আমি অনেক ভেবে-চিন্তে আজ রাজি হ'য়ে এসেছি।

—রাজি হবে না! সুরমা এবার রীতিমতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। যে দিনকাল পড়েছে, কত সব ভালো-ভালো এম. এ. পাশ ছেলে পঞ্চাশ টাকার জন্যে ঘুরে মরছে—আর এ তো চমৎকার! ক'টা লোক আজকাল একশো টাকা রোজগার করে! তার উপর আবার কমিশন দেবে, অ্যাঁ ?

অনুপম বললে—এম্. এ. পাশ হ'লেই তো হ'লো না, কাজের লোক হওয়া চাই। ইনশিওরেন্স কোম্পানি বিদ্যা বোঝে না, কাজ বোঝে।

—তা কাজটা কী করতে হবে ?

—ওঃ, কাজ! কাজ বিশেষ-কিছু নয়। আমার অধীনে সব এজেণ্ট থাকবে, তারা বিজনেস জোগাড় করবে, তাদের একটু দেখাশোনা করতে

হবে, এই আরকি। ভাবছি ছ'মাস পরে ছোটো একটা গাড়িই কিনে ফেলবো। বাইরে ঘোরাঘুরি আছে কিছু।

মাইনে ভালো, অথচ কাজ কিছু নেই। সুরমার ঠিক যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। আর এমন একটা সুখের কাজ বাংলাদেশের এত ছেলেকে এড়িয়ে তার স্বামীর হাতে কেমন ক'রে এলো ভাবতে সে রীতিমতো অবাক হ'লো। তা অবাক হ'য়ে আর কী হবে—মানুষের কপাল যখন ফেরে, তখন এই রকমই।

—কাউকে বলতে বারণ করলে কেন?—সুরমা নিজের সৌভাগ্য একা-একা সহ্য করতে পারছিলো না—হ'য়েই তো গেছে।

—হ'য়ে গেলোই বা। কাজকর্মের ব্যাপার—বাইরে বেশি বলাবলি না-করাই ভালো।

—আহা, বাইরে আমি কাকে আর ঢাক পিটিয়ে বেড়াবো। শ্বশুরমশাইকে বলেছো?

—না, বলিনি এখনো। বাবার ইচ্ছে ছিলো আমি গবর্মেণ্টের চাকরিতে ঢুকি, হয়তো তিনি খুব খুসি হবেন না। হাজার হোক্, সামান্য কোম্পানির চাকরি বই তো নয়।

—কী যে বলো! সামান্য হ'লো কিসে! আর গবর্মেণ্টের চাকরি চাইলেই যে পাওয়া যাচ্ছে তা তো নয়। শ্বশুরমশাই খুবই খুসি হবেন, দেখো।

হ'লেনও। অনুপমের এ-কাজে বিলিতি কাপড়চোপড় না হ'লে নাকি চলবে না, ও-সব করাতে গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হ'য়ে গেলো। হেমবাবু ধার ক'রে এনে দিলেন টাকাটা। তারপর কয়েকদিন সেই শ্বেতাঙ্গ বেশে অনুপম নিয়মিত যাতায়াত করলে—ইতিমধ্যে গোটা দুই নতুন টাই কেনা হ'য়ে গেলো। সুরমা বিছানার তলায় পাৎলুন ভাঁজ ক'রে রাখে, টাই

মোজা রুমালের হিসেব রাখে, আর বাড়ির মধ্যে সারাদিন অকারণে অফুরন্ত কাজ ক'রে বেড়ায়।

আজ তাই স্বামীকে খাওয়ার পর শুয়ে পড়তে দেখে সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলো। রোজ একসময়ে আপিসে না গেলেও হয়-তো চলে, কিন্তু একেবারে শুয়ে থাকলে চলে কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপম উঠলো, উঠে একটা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে বললে—চললুম।

—আজ স্যুট পরবে না?

—না, যা গরম।

স্বামীর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে সুরমার একটু কষ্ট হ'লো। ভাদ্রমাসের রোদ্দুর সমস্ত গায়ে পিন ফুটিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে বেরুনো! তাই সে বললে—আজ না-বেরোলেও চলে নাকি?

—বেরোলেও হয়, না বেরোলেও হয়। শরীরটা আজ মোটে ভালো লাগছে না।

—তাহ'লে আজ আর না বেরোলে। একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও।

অনুপম হেসে বললে—আমাদের ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠাতে হয় না, যতদিন খুসি না গেলে কেউ কিছু বলবার নেই।

—বলো কী! যতদিন খুসি না গেলেও চলে?

—তা চলে বইকি। ওদের কাজ পাওয়া দিয়েই কথা।

—কাজটা তাহ'লে ওরা কেমন ক'রে পাবে?

—তুমি তা বুঝবে না।

সুরমা আর কিছু বললে না। সত্যি, কাজটা যে কী রকম তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। অনুপমও আর কথা না ব'লে পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে এসে শুয়ে পড়লো, এবং খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়লো। উঠলো যখন, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সুরমা চা ক'রে এনে দিলে। চা খেয়ে

ধোপদুরস্ত জামাকাপড় প'রে অনুপম বেরিয়ে গেলো বোধ হয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে।

তার পরের দুটো দিন এইভাবেই কাটালো সে। সুরমা মাঝে-মাঝে দু'একবার তাড়া দিলে, কিন্তু অনুপম নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বললে—তুমি তো দেখছি ভারি ছেলেমানুষ! এজেণ্টরাই সব কাজ করে যে। আমার বেরোবার কী দরকার। এই তো আজ বিকেলেই দু'জনের আসবার কথা আছে আমার কাছে।

সত্যিও সেদিন বিকেলে দুটি ছেলে এলো তার কাছে। অনুপম তাদের সঙ্গে ব'সে-ব'সে অনেকক্ষণ কথা বললে। সুরমা চা পাঠালে, খাবার পাঠালে, পান পাঠালে। ভারি খুসি হ'লো সে মনে-মনে।

পরের দিন সকালে ন'টা না-বাজতেই অনুপমের বেরোবার তাড়া লেগে গেলো। আজ তাকে যেতে হবে ভাটপাড়া, সেখানে একজন বড়োদরের মক্কেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। অসম্ভব তাড়াহুড়ো ক'রে, কোনোরকমে দুটো গরমভাত আর মাছের ঝোল গলাধঃকরণ ক'রে, পোষাক প'রে, মা-র কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো। তার কিছুই খাওয়া হয়নি ভাবতে পরে সুরমাও ভালো ক'রে খেতে পারলে না—তিনটে না-বাজতেই উঠে স্টোভ ধরিয়ে নানারকম খাবার তৈরি করতে বসলো।

এদিকে অনুপম আপিসে গিয়ে খবর পেলো ভাটপাড়ার ভদ্রলোককে অন্য কোম্পানির লোক পাকড়ে ফেলেছে। ব'সে-ব'সে আড্ডা দিলো ঘণ্টা তিনেক, তারপর আর-একজনের সঙ্গে বেরিয়ে ড্যালহৌসি স্কোয়ার, ক্লাইভ স্ট্রিটে এ-আপিস ও-আপিস ঘুরে বেড়ালো যেখানে যত চেনা লোক আছে। কোথাও একপেয়ালা চা, কোথাও পান, নানারকম লাখ-বেলাখের গল্প, সময়টা কাটলো মন্দ না। কিন্তু রোদ্দুরে ঘুরতে আর ভালো লাগে না, যা-ই বলো।

বিকেলে বাড়ি ফিরে যখন চা খাচ্ছে, সুরমা জিজ্ঞেস করলে—কেসটা পেলে ?

—কোন্… ?

—ভাটপাড়ায় গেলে যে ?

অনুপম বলতে পারলে না যে ভাটপাড়ায় সে যায়নি। সংক্ষেপে বললে—আর-একদিন যেতে হবে।

—কবে যাবে ? কাল ?

—এত খবর দিয়ে তোমার দরকার কী ? আমার কাজ আমি ভালো বুঝি।

পরের দিনও সে যথাসময়ে রাজবেশ প'রে বেরুলো, যথাসময়ে ফিরে এলো। তারপর একদিন সে সুরমাকে বললে—আর-একটা অফর পেয়েছি, এর চেয়ে ভালো।

—কী রকম ?

—এক ভদ্রলোক একটা বিজনেস করবেন, আমাকে পার্টনর ক'রে নিতে চান। লায়ন্স রেঞ্জে আপিসের ঘর খোঁজা হচ্ছে। এখন অবশ্য মাত্র হাজার দশেক নিয়ে আরম্ভ হবে—তবে ভদ্রলোক কুড়ি হাজার পর্যন্ত ফেলতে রাজি। তাঁর নিজের আরো অনেক কাজ আছে—আমাকেই ম্যানেজার হ'তে হবে। আপিসে আলাদা ঘরে বসবো, টেলিফোন থাকবে, বাড়িতেও একটা রাখতে হবে। তুমি যখন তখন দরকার হ'লে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। বেশ ভালো—কী বলো ?

সুরমা জিজ্ঞেস করলে—ব্যবসাটা কিসের ?

—সে নানারকম আছে। ঐ ভদ্রলোকের দশরকম ব্যবসা আছে কলকাতায়—কাগজ, কাঠ, কয়লা, তাছাড়া একটা জুয়েলারি দোকানও আছে। মস্ত বড়োলোক। পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলতেও ওর আটকাবে

না। আমাকে গোড়াতে দু'শো দেবে, আস্তে-আস্তে পাঁচশো পর্যন্ত উঠবে। লাভের উপর আমার টু পর্সেণ্ট শেয়ারও থাকবে, তাইতে বা কোন্ না দু'চার হাজার হবে বছরে। আর আপিসের গাড়িটা অবিশ্যি আমার জন্যেই থাকবে। আমাদের কয়েকজন কেরানি দরকার—আছে নাকি তোমার জানাশোনা কোনো ছেলে-ছোকরা ?

সুরমা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি তাহ'লে ইনশিওরেন্সের কাজটা ছেড়ে দেবে ?

—ছেড়ে দেবো না তো কী! ঐ মাইনেতে কোনো ভদ্রলোকের কি চলে! আর যা খাটনি! রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে হয়রান।

—তা যেখানেই যাও ব'সে-ব'সে তো তোমাকে কেউ খাওয়াচ্ছে না।

—তুমি কিছু বোঝো না। এটা কত ভালো। আপিসটাই আমার, সবই আমার ইচ্ছেমতো হবে। আমার পার্টনর নিজে বিশেষ-কিছু দেখতে-শুনতে পারবেন না, আমি রাজি হয়েছি ব'লেই তিনি ব্যবসাটা ফাঁদবেন।

—অত বড়ো একটা ব্যবসা চালাতে তুমি পারবে তো? ব্যবসাতে তো খাটুনি সব চেয়ে বেশি শুনি।

—ওঃ, সে ঠিক হ'য়ে যাবে দু'দিনেই। দু'চারখানা বইপত্র দেখে নিলেই হবে। তাছাড়া, আমার নিজের তো বিশেষ-কিছু করতে হবে না, নিচে তো সব কেরানিরাই থাকবে। শিগগিরই আমরা আরম্ভ ক'রে দেবো—আপিসের একটা ভালো ঘর পেলেই হয়।

হঠাৎ সুরমার কী-রকম একটা সন্দেহ হ'লো। জিজ্ঞেস করলে—ইনশিওরেন্সের কাজটা এক্ষুনি ছেড়ে দাওনি তো ?

অনুপম মুচকি হেসে বললে—তা একরকম ছেড়েই দিয়েছি বলতে পারো।

সুরমার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। ক্ষীণস্বরে বললে—একেবারে

ছেড়েই দিলে! ওটার তো এখনো ঠিক নেই। শ্বশুরমশাইকে একবার জিজ্ঞেসও করলে না!

—ওঃ, বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করবো কী। এ-সব ব্যাপারের উনি বোঝেনই ভারি। তাছাড়া, কিছু ঠিক নেই বলছো কেন? ? কোম্পানি শিগগিরই রেজিস্টর্ড হবে। আরে ভাবছো কেন—বাবার দুঃখ এতদিনে দূর হ'লো। বাবাকে আর একবছরের বেশি চাকরি করতে দেবো নাকি ভেবেছো!

কথাটা শুনে সুরমা রোমাঞ্চিত হ'লো, কিন্তু ছোট্ট একটু সন্দেহ তার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিলো না। তাই সে বললে—কিন্তু ব্যবসা তো, তার নিশ্চয়তা কী? বাঁধা একটা চাকরি হুট ক'রে ছেড়ে দিলে!

—ভারি তো বাঁধা চাকরি। ব্যাটারা ভারি পাজি, ছোটোলোক, কথা দিয়ে কথা রাখে না, টাকা-পয়সা কিছু দিতে চায় না!

সুরমা অবাক হ'য়ে বললে—বলো কী! চাকরিতে কখনো মাইনে না দিয়ে পারে! মাস পুরলে নিশ্চয়ই দেবে। তুমি ওদের সঙ্গে খামকা ঝগড়া করোনি তো?

এবারে অনুপম বেশ উত্তেজিত স্বরেই বললে—ওদের যা ব্যবহার, তাতে ঝগড়া না ক'রে পারা যায় না। আছে, ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে। মান-সম্মান নিয়ে ওদের কাজ করা যায় না। দিয়েছি আজ খুব দু'কথা শুনিয়ে।

সুরমা হতাশ স্বরে বললে—তাহ'লে ছেড়েই দিয়েছো।

অনুপম একটু হেসে বললে—আহা, তুমিও যেমন! এমন একটা ভাব করছো যেন কত বড়ো একটা লোকসান। ও-রকম চাকরি পথে-ঘাটে অনেক ছড়িয়ে থাকে।

কথাটা আসলে সত্য কেননা বীমার দালালি আজকাল চাইলেই পাওয়া

যায়। কিন্তু যতখানি কাজ করতে পারলে তা থেকে মাসে পঞ্চাশটা টাকাও আয় করা যায়, অনুপমের পক্ষে তা অসম্ভব। অবশ্য আসল কথাটা জানে না ব'লেই সুরমা চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে বললে—বলো কী! আজকালকার দিনের পক্ষে ও তো চমৎকার চাকরি ছিলো। আমি তো মনে করি ও-রকম একটা কাজ পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অনুপম তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—তুমি ভাবতে পারো সৌভাগ্য, আমি ভাবিনে। তাছাড়া, কত একটা বড়ো কাজে যাচ্ছি। ছাখো না হু' পাঁচ বছরে কী হয়। শোনো—ভদ্রলোক বলছেন আমাকেও কিছু টাকা ফেলতে। বেশি নয়, হাজার পাঁচেক। তাহ'লে লাভের টেন পর্সেণ্ট দিতে রাজি। টেন পর্সেণ্ট মানে জানো? বছরে হাজার কুড়ি তো বটেই। বলবো নাকি বাবাকে একবার?

সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললে—দেখতে পারো ব'লে।

একটু যেন দ্বিধা ক'রে অনুপম বললে—আচ্ছা, তোমার বাবা কি কিছু দিতে পারেন না?

সুরমা ম্লান হ'য়ে গিয়ে বললে—আমার বাবা গরিব মানুষ, তিনি অত টাকা কোথায় পাবেন?

একটু যেন লজ্জিতভাবেই অনুপম বললে—আচ্ছা, থাক, থাক। এমনি একটা কথার কথা বলছিলাম। তুমি কিছু ভেবো না। এ-ব্যবসায় লাভ আমাদের হবেই। অবশ্য রিস্‌ক্ যে কিছু নেই তা নয়—রিস্‌ক্ সব ব্যবসাতেই আছে—তা একটু রিস্‌ক্ না নিলে জীবনে কি বড়ো হওয়া যায়! তুমিই বলো!

সুরমা আবার জিজ্ঞেস করলে—ব্যবসাটা কিসের?

অনুপম আবার জবাব দিলে—আছে নানারকমের।

—ইনশিওরেন্সের কাজটা এ-ক'দিন ক'রেই ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে

কিনা কে জানে। কিছুদিন করলে হয়তো ভালো লাগতো। মোটে তো ভালো ক'রে করলেই না।

—আরে ছি-ছি, এ-কাজ কি ভদ্রলোকে করতে পারে! দু'দিনেই আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। বললুম না তোমাকে, ওরা অত্যন্ত বদ লোক—কথায়-কথায় অপমান করে।

—তা এ-ক'দিনের মাইনে দিয়ে দিয়েছে তো?

—তা দিলেও তো বুঝতুম। কিছু না, এক পয়সাও না।

—বলো কী, এ-ক'দিন খাটিয়ে নিলে, তার মজুরি দিলে না! এ কি সম্ভব নাকি?

—ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

—বাঃ, এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি। আইন আছে কী করতে? একটা উকিলের চিঠি দাও—বাপ-বাপ ক'রে টাকা দিয়ে দেবে।

—ব'য়ে গেছে এখন আমার সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে অত হাঙ্গামা করতে। বিজনেস-এর জন্য এখন ভয়ানক খাটতে হবে কিছুদিন। অত সময় কোথায় আমার।

—তাই ব'লে তুমি চুপ ক'রে এ-ও সহ্য করবে?

—খুব দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি—আবার কী? আমাদের ব্যবসাটা জাঁকিয়ে উঠুক, তখন ঐ পচা কোম্পানির ম্যানেজারকে কেরানি রাখবো।

এর পর কয়েকদিন অনুপমকে সত্যি খুব ব্যস্ত দেখা গেলো। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার সে বেরোয় আর বাড়ি ফেরে। অদ্ভুত সময়ে ও অদ্ভুত জায়গায় তার সব এনগেজমেণ্ট থাকে। টেলিফোন ছাড়া কাজের বড্ড অসুবিধে হচ্ছে, সামনের মাসের গোড়ার দিকেই একটা আনিয়ে ফেলবে। কিছুদিন তার পকেটে কিছু টাকা-পয়সাও দেখা যেতে লাগলো। তাছাড়া

পকেটে তার প্রায়ই সচিত্র পুস্তিকা দেখা যায়—মোটরগাড়ির ক্যাটালগ। আপিসের গাড়ি কেনা হবে—সে-ভারও তারই উপর পড়েছে।

দিন পনেরো এইভাবে কাটলো। ততদিনে সুরমারও প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে এসেছে যে বাণিজ্যেই বসতে লক্ষ্মী। এখন ভালোরকম সব চললেই হয়।

রাত্তিরে শোবার সময় ছাড়া অনুপম আজকাল প্রায় বাইরে-বাইরেই থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর পাছে ভেঙে যায়, সে ভাবনায় তার মা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন। কিন্তু অনুপমের সে-সব বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই তার। তার নামে সব বড়ো-বড়ো খামে টাইপ-করা চিঠিপত্র আসে। নানারকমের লোক আসে বাড়িতে। হ্যাঁ—এ না হ'লে আর ব্যবসা কী! সুরমা ভাবে, এতদিনে তার স্বামী নিজের প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছেন, একদিন সত্যি-সত্যি বিরাট কিছু হ'য়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। কার মধ্যে কী থাকে বলা তো যায় না।

আরো কিছুদিন গেলো। তারপর একরাত্রে শুয়ে-শুয়ে অনুপম বললে—ভাখো, কলেজ স্কোয়ারের কাছে পাঁচশো টাকায় একটা চায়ের দোকান বিক্রি হচ্ছে। ভাবছি বাবাকে ব'লে সেটা কিনে ফেলি। পাঁচশো টাকা তিনি নিশ্চয়ই দিতে পারবেন।

সুরমা অবাক হ'য়ে ব'ললে—কেন, চায়ের দোকান কিনে তুমি কী করবে?

—কী আবার করবো? চালাবো। মাসে দু'শো টাকা নেট প্রফিট।

—বলো কী! মাসে দু'শো টাকা যাতে লাভ, সে-দোকান পাঁচশো টাকায় ছেড়ে দিচ্ছে! লোকটা কি পাগল?

সঙ্গে-সঙ্গে সুর নামিয়ে অনুপম বললে—না, ঠিক দু'শো হয়-তো হবে না।

দেড়শো—হ্যাঁ, একশো তো হবেই। ব'লে-ক'য়ে পাঁচশোতেই রাজি করাতে পারবো বোধ হয়। লোকটার ব্যামো হয়েছে—পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে চ'লে যেতে চায়।

—তোমার হাতে সেই কোম্পানি রয়েছে—এত বড়ো ব্যবসা—

—হ্যাঁ, বিজনেসটা রয়েছে বটে। তা চায়ের দোকানটাও থাক্ না। গোটা কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে একটা লোক রেখে দিলেই হবে। আমি তো নিজে গিয়ে দোকানে বসতে পারবো না। বুঝলে না—চার-পাঁচটা কলেজের কাছে কিনা, ছাত্রদের ভিড় খুব হয়। বেশ লাভ।

—নিজে না-দেখলে দোকান চলে না।

—হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে আসবো বইকি। কালই বলবো বাবাকে। আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে একটা ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁও ক'রে তোলা যায়। তাহ'লে অবশ্য চৌরঙ্গি পাড়ায় তুলে আনতে হয়।

হঠাৎ সুরমার মনে পড়লো সেই ব্যবসার কথা স্বামীর মুখে কিছুদিন শোনা যাচ্ছে না। কেমন একটা ভয়ের ভাব এলো তার মনে, খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ হবে?

—জোগাড়যন্ত্র চলেছে। এ-প্রসঙ্গে অনুপমের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেলো না।

—এ-মাসের প্রথমেই আরম্ভ করবার কথা ছিলো না?

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এইভাবে অনুপম বললে—চায়ের দোকানটাই কিনে নেবো। আমাদের কালীপদ বেশ বিশ্বাসী লোক, তাকেই বসিয়ে দেয়া যাবে। ও তো বাড়িতে আট টাকা মোটে মাইনে পাচ্ছে, আমি কুড়ি টাকা দেবো—আচ্ছা, না-হয় পঁচিশই দেয়া যাবে। ওর পক্ষে কত বড়ো একটা লিফ্‌ট্ ভাবো তো।

বোধ হয় সেই কথাই ভাবতে-ভাবতে অনুপম খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

আরো কয়েকমাস কাটলো। অনুপম যেদিন খুসি হয় বাড়িতে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোয়, যেদিন খুসি হয় পোষাক প'রে বেরোয়। কোথায় যায়? একটি মন্থলি টিকিট নিয়ে শহরের এমন জায়গা নেই যেখানে সে না যায়। বড়োবাজারে তার আনাগোনা, ড্যালহৌসি স্কোয়ারে বহু আপিসে তার ঘন-ঘন আবির্ভাব। কিছু কাজ নেই, সুতরাং সে সব চেয়ে ব্যস্ত। তার পাশ দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার স্রোত ব'য়ে চলেছে, সেই ঘূর্নির মারপ্যাচে ঢোকবার যতবারই চেষ্টা করে, ততবারই ফিরে আসে ধাক্কা খেয়ে। ঘর্মাক্ত ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে এসে বলে—উঃ, এত ভয়ানক পরিশ্রম আর সয় না।

সত্যি, অকারণে নিরুদ্দেশে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়ানো—কতদিন মানুষ তা সইতে পারে? কতদিন, আর কতদিন?

এটাও মানতে হবে যে সে এখন বিজনেসম্যান। অবশ্য সেই কুড়ি-হাজারি কোম্পানিটা শেষ পর্যন্ত হ'লো না, সমস্ত ঠিকঠাক হবার পরে যে-লোকটি টাকা দেবে, সে-ই শেষ মুহূর্তে পেছ-পা হ'লো—লোকটাকে শূকরসন্তান বললে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হয় না। পৃথিবীর সব লোকই এইরকম—ইতর, অশিক্ষিত, ধূর্ত, স্বার্থপর ও প্রতারক—এতগুলো খারাপ লোকের মধ্যে একমাত্র ভালো লোক অনুপমের উপায় কী? তা সেও একটা বিজনেস চালাচ্ছে, ক্লাইভ রোতে এক বন্ধুর অপিসে একটা চেয়ারে গিয়ে মাঝে-মাঝে দু' তিনঘণ্টা ব'সে থাকে। বিজনেসটা কী, সেটা সুরমা এখনো জানে না, যখন বেশ ফেঁপে উঠবে তখন জানতে পারবে। তবে সেটা চায়ের দোকান নয়। দোকানদারি করাটা ঠিক ভদ্রলোকের কাজ কি? 'দোকানে যাচ্ছি', বলতে কেমন বিশ্রী লাগে না? 'আপিসে যাচ্ছি', কথাটাই বেশ। তাও নিজের আপিস। অনুপম এখন নিজের আপিসে যাচ্ছে।

এইভাবেই আরো এক বছর কাটলো। হেমবাবু মলিন জিনের কোট প'রে আপিসে যান, আপিস থেকে ফিরে খালি গায়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকেন, মাসের পয়লা তারিখে প্রচুর ধার শোধ করেন ও সাত তারিখে আবার ধার করতে ছোটেন। বড়ো ছেলের সঙ্গে বিশেষ দেখাশোনা হয় না তাঁর। একদিন, সন্ধেবেলায় অনুপম বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, বাইরের ঘরে বাপের মুখোমুখি প'ড়ে গেলো। সে এড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হেমবাবু তাঁকে ডাকলেন। একটুখানি কেশে, অত্যন্ত যেন লজ্জিতভাবে বললেন—

—শোন্—আমাদের আপিসে একটা চাকরি খালি হয়েছে।

অনুপম চুপ ক'রে রইলো, যেন এ ব্যাপারে তার কিছুই এসে যায় না।

—আমি তোর কথা সাহেবকে বলেছি, তবে যা দিনকাল—

—কী চাকরি?

—মন্দ নয় খুব। পঞ্চাশ টাকা থেকে আরম্ভ—

—ওঃ, পঞ্চাশ টাকা! অনুপম খুব মৃদুস্বরে বললে কথাটা, অসম্ভব আজগুবি কিছু শুনে যেন সে প্রায় হতবাক হ'য়ে গেছে।

—পঞ্চাশ থেকে সওয়াশ', তারপর ডিপার্টমেণ্টল পরীক্ষায় উৎরোলে হয়তো তিনশো পর্যন্ত যাওয়া যাবে। গবর্মেণ্টের বাঁধা স্কেলে আস্তে-আস্তে উঠে যাবি—বেশ ভালোই তো।

অনুপম বললে—পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে!

খুব কুণ্ঠিতস্বরে বললেন হেমবাবু—আপাতত আর কিছু যখন হচ্ছে না—। আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করিয়ে রেখেছি—কাল সেটা দিতে হবে।

অনুপম বাপের মুখের উপর আর-কিছু বললে না, পরের দিন দরখাস্ত

সই ক'রে দিলে। স্ত্রীকে বললে—দুঃখেকষ্টে বাবার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আমাকে পঞ্চাশ টাকার কেরানিগিরি করতে বলছেন।

সুরমা বললে—ঐ পেলেই কত লোক আজকাল কৃতার্থ।

—কত লোক হ'তে পারে, আমার কথা আলাদা। বিজনেস্-এর লাইন আমি ছাড়বো না। আমার একটা স্কীম আছে—সেটা হ'য়ে গেলে তো আর কথাই নেই। দস্তুরমতো গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি জাঁকিয়ে থাকতে পারবো।

স্কীমটা কী, সুরমা তা শুনতে চাইলো না। শুনেই বা কী হবে, সে সামান্য মেয়েমানুষ, ও-সব বড়ো-বড়ো ব্যাপার বুঝবে না।

অনুপমই আবার বললে—কলকাতার সহরে একটু বুদ্ধি থাকলে মাসে শো পাঁচেক আয় করা তো কিছুই না। ত্যাখো না সব মাড়োয়ারিদের—না জানে লেখাপড়া, না পারে ভদ্রলোকের মতো একটা কথা বলতে। একজন মাড়োয়ারির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তার কাছ থেকে সব ফন্দি-ফিকির শিখে নিচ্ছি। দেখবে আর দু'দিন পরে।—হ্যাঁ, আমাকে একটা টাকা দাও তো।

সুরমা বললে—একটা টাকা?

—একটা টাকাও নেই তোমার কাছে?

—আমার কাছে টাকা থাকবে কোত্থেকে?

—কেন, বাজার-খরচ তো তোমার হাতেই আজকাল। আচ্ছা, এক টাকা না পারো আট আনা দাও।

—এক টাকাই দিচ্ছি। নিজের জমানো দুটি আধুলি সুরমা বার ক'রে দিলে।

মাঝে-মাঝে এমন দেয়। তার হাতে দু'চার আনা পয়সা যা আসে সব সে সযত্নে জমিয়ে রাখে, যে-কোনো দিন স্বামীর দরকার হ'তে পারে।

পরের দিন হেমবাবু আপিস থেকে খানকয়েক বই নিয়ে এলেন। অনুপমকে ডেকে বললেন—এগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখিস তো একটু—ইণ্টারভিয়ুর জন্যে ডাকতে পারে।

—পঞ্চাশ টাকার চাকরি, তার আবার ইণ্টারভিয়ু!

—ইনকম-ট্যাক্সের আইনগুলো একটু দেখে নিস। কিছু জিজ্ঞেস করলে দু'একটা কথা বলতে পারলেই হ'লো।

—বাবার একদম মাথা-খারাপ হয়েছে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুপম বললে। আমাকে বলছেন ইনকম-ট্যাক্সের বই পড়তে। এখনো যেন আমার পরীক্ষা পাশ করবার বয়েস আছে। হো-হো ক'রে হেসে উঠলো সে, হাসিটা অত্যন্তই উচ্চ।

—ভালোই তো। বছরে একখানা বই তো ছুঁয়ে ছাখো না। তবু একটু পড়াশুনোর চর্চা হবে।

—ওঃ, পড়াশুনোর এই তোমার ধারণা! ইনকম-ট্যাক্সের আইন! অনুপম আরো জোরে হেসে উঠলো।

বইগুলো সে একবার ছুঁয়েও দেখলো না। সন্ধেবেলা আপিস থেকে ফিরে নাকের নিচে চশমা নামিয়ে হেমবাবুই সেগুলো পড়তে বসলেন। রোজই এ-রকম হ'তে লাগলো; যখনই সময় পান, হেমবাবু ব'সে ব'সে ইনকম-ট্যাক্সের আইনের সমস্ত মারপ্যাঁচ আয়ত্ত করেন। অনুপম তাঁকে একদিন দেখে ফেললো। হাসতে-হাসতে সুরমাকে বললে—দেখেছো বাবার কাণ্ড! তিনি বই পড়লে কি আমার বিদ্যে হবে!

সুরমা শান্তভাবে বললে—ও, সেটা তাহ'লে বোঝো!

—আমাকে দিয়ে ও-সব রাবিশ চাকরি পোষাবে না তা তো আমি ব'লেই দিয়েছি।

তারপর, একদিন আপিসে সায়েবের কাছে তার ডাক পড়লো। না

গেলে বাবা নেহাৎই দুঃখিত হবেন, শুধু সেই কারণেই সাজগোজ ক'রে গেলো সে। ফিরে এসে বললে—সায়েব আমাকে বললে, তুমি আমাদের হেমবাবুর ছেলে, তোমাকে নিতে পারলে তো ভালোই হয়। তা আপাতত এটা নিলে কেমন হয়, বলো তো? বিজনেসটা একটু ফেঁপে উঠলে ছেড়ে দিলেই হবে। হাত-খরচটার জন্য আরকি—বুঝলে না?

সুরমা বললে—আপাতত হাতখরচ ছাড়া আর-কোনো খরচও তো নেই তোমার।

—আহা, কোনোরকমে দিন কাটলেই কি হ'লো! বাবার অবস্থা দেখছো তো! সেই মাড়োয়ারিটা যা বলে তাতে তো মনে হয় ছ' মাসের মধ্যেই খুব সুবিধে হ'য়ে যাবে।

কয়েকদিন পরে অনুপম বাড়ি ফিরে দেখে সুরমার মুখ ভারি গম্ভীর। জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে তোমার?

—তোমার চাকরির খবর এসেছে।

—কী খবর? অনুপম খুব তাচ্ছিল্যের সুরেই জিজ্ঞেস করলে, তবু তার গলাটা একটু কেঁপে গেলো।

—হয়নি। শ্বশুরমশাই ভারি ভেঙে পড়েছেন।

মুহূর্তের জন্য ম্লান হ'য়ে গেলো অনুপমের মুখ। কিন্তু তক্ষুনি আবার বললে—ওঃ, বাঁচলাম। হ'লে মুস্কিলই হ'তো—বাবার জন্য না নিয়েও তো পারতাম না। আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি এখন থেকে শেয়ার মার্কেটেই মন দেবো। এ ছাড়া আর কিছুতে পয়সা নেই। গোড়াতে হয়তো মাসে দু'শো আড়াইশোর বেশি হবে না—ক্যাপিট্যাল না থাকার এই তো মুস্কিল। তবে বছরখানেকের মধ্যে পাঁচশো মতো সহজেই হ'য়ে যাবে। আমাদের এ-বাড়িটা ভারি ছোটো—এটা ভাড়া দিয়ে তখন বড়ো বাড়িতে যাবো, কী বলো?

উন্মীলন

বেলা সাড়ে-আটটা আর সাড়ে-দশটার মধ্যে বালিগঞ্জ থেকে শহরগামী ট্রামে বসবার জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব—যদি না আপনার বাসস্থান ইষ্টিশান থেকে আধ মাইলের মধ্যে হয়। লেক মার্কেটের কাছাকাছি আসতে-আসতে ট্রামটিতে আইনত একটি ইঁদুরেরও আর জায়গা থাকে না; কিন্তু ইঁদুরের পক্ষে যা অসম্ভব, মানুষের পক্ষে যদি তা সম্ভব না হবে তাহ'লে কি এত বড়ো সভ্যতাই গ'ড়ে উঠতে পারতো, না কি কলকাতার আপিসগুলোই এমন নির্বিঘ্নে চলতো। ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, গরম, সিগারেটের ধোঁয়া,, সঙ্কীর্ণ আশ্রয়ে আন্দোলিত হ'তে-হ'তে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করবার শঙ্কিল কসরৎ—তারপর কাঁটায়-কাঁটায় আপিসে পৌঁছিয়ে নিজের চেয়ারটিতে বসবার সার্থকতা। স্টেশনের কাছাকাছি থাকলেও বসবার জায়গা যে পাওয়া যাবেই তা বলা যায় না; দাঁড়িয়ে যেতে হবে এ-কথা মনে ক'রেই বাড়ি থেকে বেরুনো ভালো। নিবারণ তা-ই করে; আর তাই শরীরের কষ্ট হ'লেও মনে তার কোনো দুঃখ নেই। যা সহ্য না ক'রে উপায় নেই, তা নিয়ে আক্ষেপ করলে দুঃখ শুধু বেড়েই চলে, আর কোনো লাভ হয় না, নিবারণের এই মত। নিবারণ

দুঃখ বাড়াবার পক্ষপাতী নয়, তাই সে কখনো আক্ষেপ করে না, নিজের মনেও জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ প্রশ্রয় দেয় না। সপ্তাহে দু'দিন যদি সে আপিসের ট্র্যামে বসতে পায়, তাহ'লেই সে মনে করে কপাল ভালো; বাকি চারদিন দাঁড়িয়ে থাকাটাকে সে কিছু মনে করে না। সপ্তাহে ছ'দিন যাবার মতো একটা আপিস যে তার আছে, এবং মাসের শেষে যে সেখান থেকে একশো পঁচিশ মুদ্রা তার করতলগত হয় এতেই সে সুখী। একশো পঁচিশ সংখ্যাটা যখনই সে মনে-মনে ভাবে তখনই তার ঈষৎ রোমাঞ্চ হয়; এমনকি, কোনো বাড়ির গায়ে একশো-পঁচিশ লেখা দেখলেও সেই নম্বরটির দিকে সে সলজ্জ সহর্ষ দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থাকে। তার চাকরি তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়—তার অবস্থায় কারই বা তা না হ'তো? সে কী, কী তার যোগ্যতা? কিছুই নয় সে, ময়দানে যত ঘাস, বাংলাদেশে তার মতো ছেলেও তত। বিধবা মা অতি কষ্টে মানুষ করেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেহাৎ সাধারণ বি. এ. পাশ, মামা কাকা পিসের জোর নেই, আর তার অদৃষ্টে কিনা এই চাকরি! নেহাৎই পিতৃগণের পুণ্যফলে ও মায়ের আশীর্বাদের জোরে এটা সম্ভব হয়েছে, নয়তো···শহরের বেকারমিছিলের দিকে তাকিয়ে নিবারণ মনে-মনে শিহরিত হয়, ঐ শীর্ণ মুখ আর ক্ষুধিত দৃষ্টি সে যে সত্যি-সত্যি এড়িয়ে গেছে তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। পঞ্চাশ টাকায় এই জাহাজ কোম্পানিতে ঢুকেছিলো, সাহেবের সুনজরে পড়ে পাঁচ বছরে একশো-পঁচিশে প্রোমোশন—অসাধারণ ভাগ্যবান না হ'লে এ রকম হয় না। এমনকি, এখন তাকে স্যুট প'রে আপিস করতে হয়, আর যদিও এতে খরচ কিছু বেড়েছে, তবু এই সম্মান উপযুক্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেছে সে। যা-ই বলো, চাকুরে মানুষকে এ পোষাকেই মানায়।

সুতরাং, বালিগঞ্জের ট্র্যামের ভিড়াক্রান্ত দুর্দশায় আর যে-ই আপত্তি

করুক, নিবারণ দত্ত কখনো করে না। আগাগোড়া দাঁড়িয়ে যাওয়াটাই সে নিয়ম ব'লে মেনে নিয়েছে, সুতরাং যেদিন বসতে পায় সেদিন মনে হয় একটা মহার্ঘ বিলাসিতার অধিকারী হ'লো। আর ফেরবার পথে রোজই অবশ্য ব'সে আসে, কেননা সে ট্র্যামে ওঠে ক্লাইভ স্ট্রিটের মোড়ে, আর লালদিঘি পরিক্রমা শেষ হ'লে তবে ট্র্যামটি ভরে। এই ব'সে আসাটুকু সারাদিনের মধ্যে তার একটি প্রধান আরাম।

নিবারণ থাকে মনোহরপুকুরে, তিনকোণা পার্কের পিছন দিয়ে যে রাস্তাটি হিন্দুস্থান পার্কে গিয়ে মিশেছে। তার বাড়ীর সামনে কাঁচা ড্রেন, উল্টোদিকে জঙ্গল, বড্ড মশা, কিন্তু অপেক্ষাকৃত খারাপ রাস্তা ব'লেই সে পঁচিশ টাকায় অমন বাড়িটি পেয়েছে। আর এমন খারাপ রাস্তাই বা কী—বড়োলোকেরই তো পাড়া, লেক কাছে, কয়েক পা হাঁটলেই ট্রাম। সেদিন কিন্তু সেই কয়েক পা-ই তার অনেকটা রাস্তা মনে হচ্ছিলো, কেননা আগের রাত্রে সে মোটে ঘুমুতে পারেনি। ছোটো ছেলেটার কী বিশ্রী এক কাশি হয়েছে, তাকে নিয়ে সারা রাত হৈ-চৈ। বাস্‌রে, ছেলেটা চ্যাঁচাতেও পারে! ফুসফুসে যার অত জোর, তার আবার অসুখ করে কেমন ক'রে? ডাক্তার দেখাতে হবে, আর ডাক্তার এসেই তো ছাইভস্ম কতগুলো ওষুধ দেবে—যাবে কয়েকটা টাকা। বরং বীণাকে কয়েকদিন আসানসোলে তার মামার কাছে রাখলে হয়—তবে যদি ছেলেপুলেগুলোর শরীর সারে।

হাঁটতে-হাঁটতে নিবারণের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো। আজ যেন সে ট্র্যামে বসতে পায়, তাহ'লে এই চল্লিশ মিনিট যা হোক একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে। ট্র্যাম এলো, সামনের জায়গাটুকুতে চার-পাঁচজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তার মন খারাপ হ'য়ে গেলো। ট্র্যামে উঠে সে করুণভাবে একবার চারদিকে দৃষ্টিপাত করলো। কাঁধ, মুখ, পিঠ, সবই

গভীর গাম্ভীর্যে অনড়; টুপির ধার, কোটের রেখা, চাদরের প্রান্ত, জুতোর ফিতে, সবই স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অফিস-অভিসারে অনন্যমনা; ভাঁজ-করা খবরের কাগজ, খোলা বই, আধ-বোজা চোখ, দৃষ্টিহীন খোলা চোখ—সবই এক লক্ষ্যে নিবিষ্ট, নিমগ্ন; সচল শুধু সিগারেটের ধোঁয়া, আসন্ন আটঘণ্টার জীবনহীন অস্তিত্বের মতোই অস্পষ্ট, শূন্য। সকলেই চলেছে এক জীবিকার তীর্থে, অনেকেই অনেকের মুখ চেনে, কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না; সমস্ত ট্র্যামে গম্ভীর অস্বাভাবিক স্তব্ধতা—মুদ্রার প্রফুল্ল সুখকর ঝঙ্কারও বিশেষ শোনা যাচ্ছে না, কারণ প্রায় সকলেরই মাসিক টিকিট। শুধু, যখন ট্র্যামটা থামছে, পাশের সেকেণ্ড কেলাস থেকে ইতর কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

খোলা জায়গাটুকুতে চার-পাঁচজনের মধ্যে নিবারণ গিয়ে দাঁড়ালো। পরের স্টপে ট্র্যাম থামতেই অন্যান্য লোকের সঙ্গে দুটি মেয়ে এলো এগিয়ে। মেয়ে দুটিকে দেখে নিবারণ আরো বেশি ক্ষুব্ধ হ'লো। যদিও আজকের দিনে আপত্তি ক'রে আর লাভ নেই, এবং যদিও বছরে দু'চারবার সে নিজেও বীণাকে নিয়ে ট্র্যামে চ'ড়েই বাংলা সিনেমায় যায়, (মিছিমিছি অতগুলো ট্যাক্সির পয়সা, তার উপর তার মাসিক টিকিট!) তবু মনে-মনে সে মেয়েদের সাধারণ যানে ভ্রমণ করবার পক্ষপাতী নয়। তার জীবনে প্রবলতম প্রভাব তার মা-র, সে নিজেও জানে না যে তার সমস্ত মতামতই আসলে ঐ সনাতনী বিধবার। বিশেষ, এই আপিসের সময়ে কোনো বঙ্গনারীকে ট্র্যামে চড়তে দেখলে তার মন তীব্র প্রতিবাদ ক'রে ওঠে। ফিরিঙ্গি মেয়েগুলোর কথা আলাদা, তাদেরও আপিস করতে হয়; কিন্তু নিবারণ কল্পনাও করতে পারে না যে কোনো বাঙালি মেয়ের এমন কোনো দরকার থাকতে পারে যাতে এক ঘণ্টা আগে কি পরে বেরুলে চলে না। তার মনে হয়, পুরুষদের শাস্তি দেয়া ছাড়া এ সময়ে

মেয়েদের ট্র্যামে ওঠার কোনোই উদ্দেশ্য নেই ; সারাদিন খেটে ঘরে-ঘরে যারা স্ত্রী-জাতিকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করছে, তাদের দাঁড় করিয়ে রেখে (দাঁড়াবারই বা জায়গা কোথায় ?) মজা দেখতেই যেন এই চপল হৃদয়হীনারা এ-সময়ে বাড়ি থেকে বেরোয়। যা-ই হোক, মেয়ে দুটি উঠলো, দাঁড়ানো যাত্রীরা যথাসাধ্য সঙ্কুচিত হয়ে তাদের জন্যে পথ ক'রে দিলে ; লেডিজ সীট থেকে দু'জন উঠে এসে তাদের দলে যোগ দিলে, আরো তিনচার জন চাকুরিজীবী উঠলেন, এবং সঙ্গে-সঙ্গে সে-জায়গাটুকু মনুষ্য-মাংসে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, পার্শ্ববর্তীর গায়ের গন্ধ না-শুঁকে নিঃশ্বাস নেয়া যায় না।

এ ভারি বিশ্রী। হাত তোলা যায় না, পা নাড়া যায় না, হাঁচি এলে হাঁচি আটকে রাখতে হয়। তার উপর কাল সারা রাত সে ঘুমোয়নি। একটু-একটু ক'রে ভিড় ঠেলে, রীতিমতো চেষ্টা ক'রে নিবারণ সামনের দিকে এগিয়ে এলো, হাতল ধ'রে দাঁড়ালো একেবারে রাস্তার সামনে। তবু ভালো, এখানে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেয়া যায়। অবশ্য এই সুখ-স্থানটির উপর অধিকার বজায় রাখা শক্ত, যখনই কেউ ওঠে কি নামে (দু'একজন নামেও, কিন্তু তাতে কিছুই সুবিধে হয় না), স'রে দাঁড়াতে হয়, এবং মুহূর্তেই জায়গাটি বেদখল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিছু বুদ্ধিবলে, কিছু ক্ষিপ্র অঙ্গচালনার ফলে নিবারণ তার আকাঙ্ক্ষিত জায়গাটিতেই দাঁড়িয়ে রইলো, ট্র্যাম চলেছে আস্তে-আস্তে, এতক্ষণে কালিঘাট ডিপো, বালিগঞ্জ দূরও কিছু !

হাজরা রোডের কাছাকাছি এসে নিবারণের প্রতিবেশীদের মধ্যে একটা নড়াচড়ার ঢেউ খেলে গেলো ; মেয়ে দুটি নামছে। নিবারণ হিসেব ক'রে দেখলো যে ঐ ভিড় ঠেলে পরিত্যক্ত আসন দখল করা তার পক্ষে অসম্ভব, তাছাড়া এলগিন রোড আর থিয়েটর রোডের মধ্যে দু'চারজন ফিরিঙ্গি

মেয়ে উঠবেই, তখন তো আবার দাঁড়াতেই হবে। একপাশে দাঁড়িয়ে মেয়ে দুটির দিকে সে হিংস্র চোখে তাকালে। দু'জনেই তরুণী; একজন ফর্সা ও লম্বা, চিক্‌চিকে কালো চুল মাঝখানে সিঁথি করা, পরনে ধব্‌ধবে ফর্সা লাল-পেড়ে শাড়ি, সুন্দর সুডৌল বাহু দুটি সোনার রুলি-পরা মণিবন্ধের কাছে সরু হ'য়ে পাঁচটি টুক্‌টুকে আঙুলে পর্যবসিত। ফর্সা মেয়েটি সামনে, এবং তাদের নামতে অন্তত দশ-বারো সেকেণ্ড সময় লাগলো, তাই নিবারণ তাকে লক্ষ্য করবার সময় পেলে যথেষ্ট। মেয়েটি সুন্দর ব'লেই বোধ হয় আক্রোশটা যেন আরো তীব্র হ'য়ে উঠলো, যেটুকু না-সরলেই নয় তার বেশি সে সরলে না, হাতলটা ধ'রেই রইলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার সৎসাহস পরাস্ত হ'লো, হাতল থেকে হাত সরাতেই চকিতে তার হাত ফর্সা মেয়েটির নগ্ন বাহুর সঙ্গে লাগলো—আর তার পরেই মেয়ে দুটি নেমে গেলো, ট্র্যাম দিলে ছেড়ে।

রাস্তা পার হ'য়ে মেয়ে দুটি ফুটপাথে গিয়ে উঠলো, যতক্ষণ দেখা গেলো নিবারণ রইলো বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আশুতোষ কলেজের কাছে ছেলেমেয়েদের ভিড়, বুঝি কোনো পরীক্ষা হচ্ছে, ঐ মেয়ে দুটিও নিশ্চয়ই পরীক্ষার্থী। মেয়েটির বাহুর স্পর্শ তার যে-হাতে লেগেছিলো, নিজের সে-হাতটির দিকে সে খানিক্ষণ তাকিয়ে রইলো, হাতল চেপে ধরলে অন্য হাতে। এখন এই হাতটি নিয়ে সে কী করে? কী ক'রে এই হাতটিকে সে বাঁচাবে নানা স্থূল ও সাধারণ স্পর্শ থেকে? যাবে, এই অদ্ভুত, আশ্চর্য স্পর্শ দু' এক ঘণ্টার মধ্যেই মুছে যাবে তার হাত থেকে, তার জীবন থেকে, তার স্মৃতি থেকে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সে তার এই ক্ষণিকের অপরূপ অভিজ্ঞতাটি মনে-মনে আবার অনুভব করবার চেষ্টা করলে। সে তো এর আগে কখনো জানেনি যে স্ত্রীলোকের দেহের স্পর্শ এই রকম। কী কোমল, কী শীতল! কচি তালশাঁসের

নরম মাংসের মতো। তার মনে হ'লো স্ত্রী-দেহের স্পর্শই সে কখনো পায়নি, যদিও সে আজ পাঁচ বছর বিবাহিত, এবং তিনটি সন্তানের পিতা। জীবনে সে দুটি মাত্র স্ত্রীলোককে কাছে পেয়েছে—তার মা আর তার স্ত্রী, দু'জনেই সেবাপরায়ণা, তার প্রতি স্নেহান্ধ, তার সুখসাধনে আত্মত্যাগী। স্ত্রীলোকের কাছ থেকে পুরুষের যা পাবার তা সে পরিপূর্ণ মাত্রাতেই পেয়েছে ও পাচ্ছে, এই রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিলো তার মনে। কিন্তু এ কী! পুরুষকে স্ত্রীলোকের যা শ্রেষ্ঠ দান, তা এই—এই নগ্ন কোমল বাহু, আর স্নিগ্ধ মসৃণ শরীর? আর এ-ই থেকেই সে কি চিরকাল বঞ্চিত?

তার চাকরি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মা তার বিয়ে দেন। সে আপত্তি করেনি—কেনই বা করবে?—দেখে-শুনে একটি ভালো বংশের সুলক্ষণা পনেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মেয়েটিও গরিবের ঘরের, কাজ করতে হবে ব'লেই এসেছিলো, প্রথম দিন থেকে মনে-প্রাণে দু'হাতে কাজ করেছে। নিবারণ তার নব-বিবাহিত দিন ও রাতগুলির কথা ভাবলো···কোথায়, কোথায় এই স্পর্শের উন্মাদনা? বীণারও তো স্ত্রীলোকের শরীর, কিন্তু তার শরীরকে কী ক'রে সে লুকিয়ে রেখেছে, কোথায় সে লুকিয়ে রেখেছে? নিবারণের হঠাৎ মনে হ'লো যে যদিও এই পাঁচ বছর তারা পাশাপাশি এক বিছানায় ঘুমুচ্ছে, তবু এ-পর্যন্ত তার স্ত্রীর শরীর সে দেখেনি। অবশ্য শরীর তার নামমাত্রই ছিলো। বড্ড রোগা ছিলো প্রথমটায়, এবারে তৃতীয় সন্তানটির জন্মের পরে দ্রুতবেগে মোটা হ'য়ে যাচ্ছে।···শরীর, শরীর, কোন দেবতার মন্দির তুমি, প্রাণময়ী প্রতিমা, আর কোন্ দেবতাই বা তোমাকে ছেড়ে চ'লে যায়, রেখে যায় খড় আর মাটি, মাটি আর খড়।

নিবারণ তার স্পর্শময় হাতখানা আর একবার চোখের সামনে খুলে

ধরলো, তারপর পকেটে ঢুকোতে গিয়েই নিয়ে এলো তুলে, পাছে সেই মহামূল্য স্ত্রী-সত্তাসার কোটের ঘষা লেগে এক্ষুনি উবে যায়।

* * * *

ফেরবার পথে নিরারণ ঘুমিয়ে পড়েছিলো!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখে সেই মেয়ে দুটি ট্র্যামে এসে উঠলো। স্বপ্ন নাকি? না, ঐ তো আশুতোষ কলেজ, বাইরে ভিড়, পরীক্ষা শেষ ক'রে ছাত্রছাত্রীরা ফিরছে। মেয়ে দুটি কিন্তু দাঁড়িয়েই। ট্র্যামে জায়গা নেই, লেডিজ সীট দুটিই মহিলাদ্বারা অধিকৃত। তড়াক ক'রে নিবারণ উঠে দাঁড়ালো, তার পাশে ব'সে ছিলেন যে আধ-বুড়ো ভদ্রলোক, তিনিও ঘোরতর অনিচ্ছায় উঠতে বাধ্য হলেন। মেয়ে দুটি অনায়াসে এসে সন্থ-পরিত্যক্ত আসনে বসলো, যে-পুরুষের উদারতায় তারা এই সুবিধেটুকু পেলে, তাকে সামান্য একটা মৌখিক ধন্যবাদ দেয়া দূরে থাক, তার দিকে একবার তাকালেও না পর্যন্ত, তার কোনো অস্তিত্বই যেন নেই। নিবারণ তাদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো। যে-নগ্ন বাহুটি তাকে স্পর্শ করেছিলো, সেটি ঠিক তার চোখের সামনেই—আর মেয়েটির মুখখানা একটু ক্লান্ত, একটু মলিন—কিন্তু এই ক্লান্তিটুকুও কত সুন্দর!

সে, নিবারণ দত্ত, পুরুষ, বি. এ. পাশ, সওয়া-শো টাকার চাকুরে—সে বাঁদর, সে বেবুন—না, সে অস্তিত্বহীন, সে নেই, তার আপিস আর তার বাড়ির বাইরে কোনোখানেই সে নেই। মেয়েটির ক্লান্ত তরল কালো চোখের দিকে সে একবার তাকালো, আর তার আপিস আর বাড়ি যেন এক প্রবল জোয়ারজলে ভেসে তলিয়ে গেলো···নেই, কোনোখানেই নেই সে।

না কি সে-ও আছে, তারও শরীর আছে, যে-শরীর উজ্জ্বল ও দুর্লভ,

যাকে শরীর দিয়ে জাগাতে হয়, যে-শরীর তার কখনো জাগেনি, আর কখনো জাগবেও না।

ফর্সা মেয়েটি বললে, 'বাড়ি গিয়ে তুই আজ কী করবি?'

অন্য মেয়েটি বললে, 'ঘুমুবো। দু'তিন দিন আর বিছানা থেকেই উঠবো না।'

ফর্সা মেয়েটি হাসলো।

অন্য মেয়েটি আবার বললে, 'পরীক্ষা ব্যাপারটা বিশ্রী। যতদিন না হয়, প্রাণ যায়, হ'য়ে গেলে আবার ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।'

'আমার পরীক্ষা দিতে বেশ লাগে।'

'তোর কথা আলাদা। অনার্সে বোধ হয় ফর্সট্ই হবি তুই।

'কে বললে তোকে?'

অন্য মেয়েটি সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে, 'আমি আর এম. এ.-টেম. এ. পড়বো না। যথেষ্ট বিদ্যে হয়েছে বাপু। তুই কি যাবি কোথাও কলকাতার বাইরে?'

'বাবা বোধ হয় মুসৌরি যাবেন। পাহাড় আমার আর ভালো লাগে না—পুরী গেলে বেশ হয়। মা-কে ব'লে দেখবো। বাবা যান্ মুসৌরি, মাকে নিয়ে আমি আর দাদা পুরী যাবো। তুইও চল্ না আমাদের সঙ্গে।'

'সত্যি বলছিস?'

'কেন, এটা এমন বেশি কথা?'

অন্য মেয়েটি চুপ ক'রে রইলো। খানিক পরে বললে, 'সেদিন শিপ্রা চ্যাটার্জিকে তোর কেমন লাগলো?'

ফর্সা মেয়েটি ঠোঁট উল্টিয়ে মাথা নাড়লে।

'ওর স্বামীটি বরং ভালো।'

'তা ভালো হ'লেই বা লাভ কী এখন?'

অন্য মেয়েটি অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, যাঃ !'

পিছনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিবারণ প্রত্যেকটি কথা শুনতে পাচ্ছিলো। তার মনে হচ্ছিলো এরা যেন কোনো বিদেশী ভাষায় কথা বলছে, সে এর এক বর্ণও বোঝে না। কিন্তু এই ভাষার ধ্বনি এত মধুর যে সঙ্গীতের ইন্দ্রজালের মতো তার মনকে আচ্ছন্ন করছে। সে এক স্বপ্নের মধ্যে ঢুকেছে, কিন্তু এই স্বপ্ন যেন না ভাঙে, হে দেবতা, এই ধ্বনির কুহক যেন থেমে না যায় !

নিবারণের বাড়ির আগের স্টপে মেয়ে দুটি নেমে গেলো।

চৈত্র দিনের আলো তখনো মিলোয়নি, কিন্তু নিবারণের একতলার ফ্ল্যাটে ইলেকট্রিকের হলদে বাতি জ্বলেছে। সে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই বীণা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো তার জুতোর ফিতে খুলে দিতে, কিন্তু নিবারণ বললে, 'থাক, আমি নিজেই খুলছি।'

বীণা অবাক হ'লো, একটু দুঃখিতও হ'লো বুঝি। এ তো তার প্রতিদিনের ধরাবাঁধা কাজ, আজ তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

'কী, জুতো খুলবে না ?'

'নিজেই খুলতে পারবো।'

বীণা শঙ্কিতদৃষ্টিতে নিবারণের মুখের দিকে তাকালো—স্বামী কি কোনো কারণে রাগ করেছেন ? ক্যানভাসের ঈজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে স্ত্রীর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিবারণ বললে, 'একটা ময়লা শাড়ি পরেছো কেন।

বীণা বললে, 'ময়লা ! এই তো সেদিন ধোপের পাট ভেঙে পরলুম।'

'মশলার দাগ লেগেছে।'

'তা দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হ'লে একটু-আধটু লাগে বইকি। পটের বিবি হ'য়ে থাকা আমাদের পোষায় না।'

নিবারণ বললে, 'সন্ধেবেলায় একখানা ভালো শাড়ি প'রে ফিটফাট হ'য়ে থাকলেও তো পারো। কী চেহারার ছিরি!'

'ওঃ, বুড়ো হ'য়ে গেলাম, এখন আবার চেহারা! ও রামের মা, ছাখো তো চায়ের জলটা ফুটলো নাকি।'

বিস্রস্ত আঁচল গায়ে তুলতে-তুলতে বীণা রান্নাঘরের দিকে চললো। যেতে-যেতে ব'লে গেলো, 'হাত মুখ ধুয়ে নাও এবারে। চা আনছি।'

নিবারণ কিন্তু জুতোও খুললে না, পোষাকও ছাড়লে না, ওখানেই ব'সে রইলো। একটু পরে বীণা চা আর খাবার নিয়ে এসে পাশের টীপয়ে রেখে বললে, 'এ কী! পোষাক প'রেই ব'সে আছো? ওঠো।'

নিবারণ কোট আর নেকটাই খুলে বললে, 'আগে খেয়ে নিই। বোসো তুমি, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

বীণা মেঝের উপর ছু'পা ছড়িয়ে বসলো, হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো নিবারণের পিঠে। কিন্তু নিবারণ খপ্ ক'রে তার হাতটা ধ'রে ফেলে বললে, 'থামো, হাওয়া করতে হবে না।'

'তোমার আজ হ'লো কী? সবটাতেই এমন বাধা দিচ্ছো কেন? ছাড়ো, হাওয়া করি।'

'না, না, হাওয়া করতে হবে না বলছি। মেঝেতে ব'সে পড়লে কেন? এই চেয়ারটাতে বোসো।'

বীণা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'মাথা-খারাপ!'

'কেন? মাথা-খারাপ হবে কেন? তোমার কি চেয়ারে বসতে নেই?' ব'লে নিবারণ বীণার পিঠের আঁচল ধ'রে টান দিলে।

'আঃ, কী অসভ্যতা করো! মা রয়েছেন পাশের ঘরে', তীব্র চাপা-গলায় বীণা বললে।

নিবারণ হঠাৎ বললে, 'একটা ব্লাউজ পরতে পারো না? খালি একটা শেমিজ প'রে থাকলে কী বিশ্রী দেখায়!'

'ওঃ, তুমি তোমার ফ্যাশন নিয়ে থাকো। প্রাণ যায় গরমে!' বীণা আশ্চর্য কৌশলে মাথার উপরে একটুখানি কাপড় বজায় রেখে গা থেকে আঁচলটা ফেলে দিলে। তারপর শেমিজের গলাটা দু আঙুলে সামনের দিকে টেনে ধ'রে আর এক হাতে নিজের বুকের মধ্যে হাওয়া করতে লাগলো। নিবারণ এ-দৃশ্য রোজই দেখে, কিন্তু আজ যেন সে সেদিকে তাকাতে পারলো না, মাথা নিচু ক'রে চা খেতে লাগলো।

বক্ষোদেশ শীতল ক'রে পাখাটা পাশে নামিয়ে রেখে বীণা বললে, 'ছোটো খোকার জন্য ডাক্তার আনবে নাকি?'

'আনবো নাকি?'

'আমি তো বলি দরকার নেই। ছেলেপুলের সর্দিকাশি এমনিই সেরে যায়। মা আজ তুলসীপাতার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছেন। এখন ভালো আছে। ছেলেপুলে নিয়ে আর শান্তি নেই। মণ্টু দুপুরবেলায় দোতলার ছেলের সঙ্গে মারামারি ক'রে নাক ফাটিয়ে এসেছে—ঐটুকু তো ছেলে, কিন্তু কী বিষম গুণ্ডা। আর দেরি না ক'রে ওকে ইস্কুলে দিয়ে দাও।'

নিবারণ বললে, 'হুঁ।'

'আর-এক কথা। সুষমার বিয়ে তেসরা বৈশাখ—মাসিমা এসেছিলেন নেমন্তন্ন করতে। যাবো নাকি ভাবছি।' স্বামীকে চুপ দেখে বীণা আবার বললে, 'না গেলে ভালো দেখায় না।'

'তা যাবে বইকি।'

'কিন্তু খালি হাতে তো আর যাওয়া যায় না। তাই ভাবছিলুম—'

'খালি হাতে যাবে কেন? কিছু নিয়েই যাবে।'

'চার-পাঁচটাকা দামের মধ্যে একখানা শাড়ি—কী বলো ? হয়েছে নাকি তোমার চা খাওয়া ? আমি যাই, মা-র ঘরে লক্ষ্মীর আসন দিতে হবে।'

নিবারণ হঠাৎ বললে, 'লাল পেড়ে শাড়ি আছে তোমার ?'

'কেন বলো তো ?'

'ফর্সা লাল-পেড়ে শাড়ি পরলে তো পারো মাঝে-মাঝে। বেশ দেখায়।'

'কেন, আজ কোনো সুন্দরীর লাল-পেড়ে শাড়ি দেখে মূর্ছা যাওনি তো ? তোমারা পুরুষমানুষ, তোমাদের বিশ্বাস নেই।'

'শোনো—কাপড়-চোপড় প'রে নাও না, একটু বেড়াতে যাই।'

বীণা যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।—'কী যে বলো তুমি, বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেলো নাকি ? এখন আমার কত কাজ !'

'কী আর কাজ। রান্না তা রামের মা-ই নামাতে পারবে। আর ছেলেপুলেদের মা দেখবেন। আর কী ? চলো। ট্যাক্সিতে যাবে গঙ্গার ধারে ? গিয়েছো কখনো ? কলকাতার গঙ্গা দেখেছো ?'

'কেন দেখবো না ? মা-র সঙ্গে তো সেদিনও স্নান ক'রে এলাম।'

'ওঃ, সে তো কালিঘাটের নর্দমা। বড়ো গঙ্গা দেখেছো—যেখানে জাহাজ এসে দাঁড়ায়,—মস্ত জাহাজ, যাতে ক'রে লোকে বিলেত যায়।'

'কাজ নেই বাপু আমার ও-সব দেখে। ঘরের কাজ ফেলে স্বামীর হাত ধ'রে বিবি সেজে বেড়ানো—ও-সব আমাকে দিয়ে হবে না।'

'কেন, বেড়ালে দোষ কী ?'

'নাও, নাও, তোম্‌মার এ-সব বাজে কথা শোনবার সময় নেই আমার।'

নিবারণ মূঢ়ের মতো বললে, 'বেড়াতে না যাও, একটু ফিটফাট হ'য়ে তো থাকতে পারো। ইচ্ছে ক'রে কুৎসিত হচ্ছো কেন ?'

'কী বললে ?' বীণা তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর দিকে জ্বলন্ত

দৃষ্টিতে তাকালো। 'ও, বুঝেছি, তোমার মতিগতি ভালো দিকে যাচ্ছে না, স্বভাব-চরিত্র ঠিক আছে কি না তা-ই বা কে জানে! বিয়ে ক'রে বৌ ঘরে এনেছো, পাঁচ বচ্ছর ঘর করছি, তিনটি ছেলেমেয়ে পেটে ধরেছি, নিজের সুখদুঃখ সবই এই সংসারের মধ্যে বিসর্জন দিয়েছি, তবু কিনা তুমি এ-সব জঘন্য কথা বলো! ঘরের বৌয়ের আবার সুন্দর কুৎসিত কী শুনি! আমাকে তো নয়নবাণ হেনে মন ভোলাতে হবে না—আমার একভাবে থাকলেই হ'লো। উঃ, রাস্তায় বেরুলে যা সব মেয়ে চোখে পড়ে আজকাল—কি বৌ কি ঝি, মেয়েগুলো আজকাল যেন ঢঙেই বাঁচে না—কেবল রংচং, কেবল চোখের চমক। বদ্, বদ্! ওরই একটা বদ মেয়ে ঘরে আনলে পারতে—সখ মিটতো কিছু। তা এ-ও বলি, এত দুঃখেকষ্টে মুখ বুজে এমন প্রাণ দিয়ে সেবা করতো না আর কেউ, টেড়ি-কাটা আর একটা ছোক্‌রা চোখে পড়লেই পিঠটান। যা সব শুনছি আজকাল চারদিকে—জাতধর্ম ব'লে আর আছে নাকি কিছু! তোমার যা অবস্থা দেখছি, বাইরে গিয়ে কিছু রস মজিয়ে এলে পারো। আমি তোমার বিবাহিতা ধর্মপত্নী, সে-কথা মনে রেখো!'

তীব্র অথচ নিচু গলায় এই কথাগুলো ব'লে বীণা চ'লে গেলো পাশের ঘরে। নিবারণ স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলো। বীণার এতখানি চটবার মতো কী যে সে বলেছে কিছুতেই ভেবে পেলো না।

রাত এগারোটার পর সব কাজকর্ম সেরে বীণা শুতে এলো। মণ্ট আর মিনু ঠাকুরমার সঙ্গেই শোয়, আর ছোটো খোকাও আজ, বোধ হয় তুলসী পাতার গুণেই, শান্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, আলো নিবিয়ে দিয়ে বীণা বিছানায় আসতেই নিবারণ দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বুকের

মধ্যে টেনে নিলে। এমন অসঙ্গত ব্যবহার সে অনেকদিন করে না, হয়তো কখনোই এর আগে করেনি।

বীণা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'এ কী! কী করছো? ছাড়ো! উঃ, যা গরম!'

বীণার গায়ে ঘামের আর পেঁয়াজের গন্ধ। শুতে আসবার আগে তার একবার স্নান করা উচিত, কিন্তু নিবারণ কিছু বলতে সাহস পেলো না—কিংবা ইচ্ছে ক'রেই কিছু বললে না। সেই দুর্গন্ধ শরীরটাকে জড়িয়ে ধ'রে প্রাণপণে চাপতে লাগলো।

বীণা আর কিছু বললে না; চুপ ক'রে স্বামীর আকস্মিক ও উদ্দাম আদর সহ্য করতে লাগলো।

অন্ধকারে, নিবারণ তার স্ত্রীর শরীর খুঁজে ফিরতে লাগলো। কোথায়, কোথায় সে তাকে লুকিয়ে রেখেছে, কোথায় হারিয়ে ফেলেছে তার উজ্জ্বল, আশ্চর্য শরীর? বীণার সমস্ত দেহদেশের উপর নিবারণের হাত বার-বার পর্যটন করলো···কিন্তু কোথায়? কোথায়? বীণার শরীর নেই। বীণার শরীর মৃত, মৃত···তার স্ত্রী-সত্তার অমূল্য উত্তরাধিকার সে হেলায় হারিয়েছে।

খানিক পরে বীণা বললে, 'হয়েছে? এখন ঘুমোও, কাল সারা রাত ঘুমোতে পারোনি।'

কোনো কথা না ব'লে নিবারণ তার হাত সরিয়ে আনলে। বীণা স্বামীর দিকে পিছন ফিরে শুলো, একটু পরেই বোঝা গেলো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন কাজকর্ম করে, রাত্রে বড়ো ক্লান্ত থাকে, শুলেই ঘুম।

নিবারণও ক্লান্ত কম নয়, কিন্তু সে-রাত্রে অনেকক্ষণ তার চোখে ঘুম এলো না। তাদের শরীর নেই, তাই জীবনও নেই, জীবনহীন অস্তিত্বে

তারা আবদ্ধ। এ-কথাটা এর আগে কখনো বোঝেনি সে, তা ভেবে অবাক লাগলো তার। কিন্তু না-বুঝলেই বুঝি ভালো ছিলো। এ কী অশান্তি যে তারও শরীর আছে, শরীরের সঙ্গেই যে জেগে ওঠে, কিন্তু কখনো সে জাগেনি, আর কখনো জাগবে না। শরীর, শরীর কোন দেবতার প্রতিমা তুমি, কোন্ দেবতা কখন এসে চ'লে গেছে, আমি কিছুই জানিনি। হে দেবতা, হে শরীর-দেবতা, সত্যি কি তুমি চ'লে গেছো, আর কি ফিরে আসবে না, রেখে গেছো শুধু খড় আর মাটি, মাটি আর খড়!

সুপ্রতিম মিত্র

রূপলালের আস্তানা থেকে বেরিয়ে ম্যালের রাস্তা ধরলুম। ভাটিয়ারা মানুষ নয়, ওদের আত্মা নেই। এই রূপলালের দারজিলিং-এ দশখানা বাড়ি, কিন্তু নিজে এসে থাকে বাজারের উপরে দু'খানা ছোট্ট খুপরি ভাড়া নিয়ে। দশখানা ভুল বললুম। এতদিন দশখানাই ছিলো বটে, আজ থেকে ন'খানা। অন্য বাড়িটি আজ থেকে আমার, এইমাত্র আগাম টাকা দিয়ে দলিল সই ক'রে এলুম।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ক্লো ভিলা কিনেই ফেললুম। যতবার দারজিলিং-এ আসি, ঐ বাড়িটিই ভাড়া ক'রে থাকি, রূপলালের নামে মোটা-মোটা চেক কম কাটিনি এ-পর্যন্ত। এবারে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট একটি চেক কেটে বাড়িটিই আমার ক'রে নিলুম, চেয়ার টেবিল বাসনকোষন সব শুদ্ধ। তেইশ হাজার এক টাকা থেকে অনেক ঝকাঝকি ক'রে কুড়ি হাজার নিরানব্বই টাকায় রফা করেছি। ঠকিনি।

ক্লো ভিলা এলিসি রোডে, 'শহর' থেকে দূরে, বেশ একটু খাড়াইও বটে, সেই জন্যে অনেকের হয়তো পছন্দ নয়। কিন্তু বাড়িটি বেশ। অনেকগুলো ঘর, অনেকখানি জমি, আর নিম্নবর্তী দারজিলিং শহরের লাল

ছাদগুলো পার হ'য়ে মনে হয় কাঞ্চনজংঘাই নিকটতম প্রতিবেশী। শোবার ঘর খাবার ঘর বসবার ঘর এমন কি দু' একটা নাবার ঘর থেকেও মেঘ আর তুষারের খেলা চোখে পড়ে। বাড়িটি বেশ লাগে আমার, বেশ লাগে।

তখন ঠিক তিনটে, হোটেলে চায়ের ঘণ্টাখানেক দেরি। হোটেলে ফিরলেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়বো, আর ঘুমিয়েই যদি সময় নষ্ট করলাম, তাহ'লে আর পাহাড়ে আসা কেন? এবারে অল্প দিনের জন্য একা এসে মাউণ্ট্ এভারেস্টেই উঠেছি। কালই ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়; বম্বে ইউনিভারসিটির কনভোকেশনে এবার আমাকে না নিয়েই ছাড়বে না, তার বক্তৃতা লেখা এখনো বাকি; তাছাড়া সামনের সপ্তাহেই ইএল-এর প্রোফেসর প্যাট্রিজ আসছেন কলকাতায়, তিনি আবার আমারই অতিথি হবেন।

বেলা তিনটেয় চৌরাস্তা প্রায় খালি, ছায়া-ঢাকা বেঞ্চিগুলোয় দু'চারটে পাহাড়ি উদাস আলস্যে ব'সে ব'সে সিগারেট খাচ্ছে, এই যা। চৌরাস্তা পিছনে ফেলে হনহন ক'রে হাঁটতে লাগলুম—যদিও আমার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কি পাহাড়ে, কি সমতলে, আমার সঙ্গে হাঁটতে হ'লে অনেক ছোকরাই হাঁপিয়ে পড়ে। পার্কে গিয়েই বসবো।

পার্কও জনশূন্য, শুধু আয়ার সঙ্গে কয়েকটি শ্বেতচর্ম শিশু, আর ঐদিকে গাছের আড়ালে কোনো তরুণ যুগল যদি থাকে। গাছের নিচে একটি বেঞ্চিতে ব'সে চারদিকে তাকালুম, চিরপুরোনো দারজিলিং হঠাৎ যেন নতুন হ'য়ে চোখে লাগলো। অক্টোবরের শেষে প্রায়ই ঘন কুয়াশায় আকাশ ও পৃথিবী মুছে যায়, কিন্তু আজকের বিকেলটি টলটলে উজ্জ্বল, আর হাওয়ায় সেই বিশিষ্ট পাহাড়ি শৈত্য যা জীর্ণ দেহে নবজীবন আনে। আজকের রোদে যেন একটি নতুন আভা, আজকের আকাশ যেন অন্য সব দিনের আকাশের চাইতে নীল। বেশ বিকেলটি।

হয়তো আজ দারজিলিং-এ একটি বাড়ির মালিক হয়েছি ব'লেই এখানকার প্রকৃতিকে এত সুন্দর লাগছে। তা-ই যদি হয়, তাতে আমি লজ্জিত হবার কোনো কারণ দেখিনে। কৃতী হ'তে, সার্থক হ'তে কে না চায়? কে না ভালোবাসে? তিরিশ টাকার ইস্কুলমাষ্টারিতে আমার জীবনপ্রবেশিকা। অকপটেই বলছি, আমার অসাধারণ বুদ্ধি কি প্রতিভা নেই; কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই দুটি জিনিস আমার ছিলো; দারুণ উচ্চাশা ও সংকল্পের দৃঢ়তা। তারই জোরে ইস্কুলমাষ্টারি করতে-করতে এম. এ পাশ করেছিলুম। তারপর বাগেরহাট কলেজের নিষ্ঠুর নির্বাসনে ব'সে-ব'সে পি আর. এস্.-এর থীসিস দিলুম, প্রথমবারে ফেরৎ এলো, দ্বিতীয়বারে শ্রম ও নিষ্ঠা হ'লো পুরস্কৃত। তার দু' বছর পরই পি. এইচ. ডি.। সেই ঈশ্বর-পরিত্যক্ত বাগেরহাটে হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমার ঘর্মক্ষরণের কথা ভাবতে এখন অদ্ভুত লাগে। আজ সে-সব দিন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

আমার আসল নাম যদি বলি, তাহ'লে শিক্ষিত বাঙালি সকলেই আমাকে চিনবেন। আচ্ছা, ধরা যাক্—ধরা যাক্ আমার নাম মহিম তালুকদার। অন্যান্য দু' একটা তথ্যও অল্প বদ্‌লে দিচ্ছি, কেননা নিজের কথা নিজের মুখে বলতে অসুবিধে লাগে। সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখুন যে এখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধানতম অধ্যাপক, বেশ বড়োদরের একটি চেয়ার গত দশ বছর ধ'রে দখল ক'রে আছি। সারা ভারতবর্ষ অতিক্রম ক'রে বিদেশেও আমার নাম পৌঁচেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে প্রথমবার ইওরোপে গিয়ে ডি. লিট. ডিগ্রি আহরণ করেছিলুম, তারপর সেবার লণ্ডন, প্যারিস ও রোমে 'ভাষাতত্ত্ব ও বিশ্বসভ্যতা' বিষয়ে বক্তৃতা ক'রে এসেছি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস সেগুলো গ্রন্থাকারে ছেপেছে। ইওরোপ বাদ দিয়ে, আমেরিকা,

জাপান, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ ও ইজিপ্ট আমি ঘুরে এসেছি, মরবার আগে আর-একবার পৃথিবী ভ্রমণ করবার ইচ্ছা আছে, এবং আমি যা ইচ্ছা করি, সাধারণত তা-ই হয়।

এখানেই যে শেষ, সে-কথাই কি কেউ বলতে পারে? গত পাঁচ-বছর ধ'রে একটু-আধটু পলিটিক্স করছি—অবশ্য খুব সাবধানে, নানারকম হিসেব ক'রে—আমার বিচক্ষণতায় আমি নিজেই মাঝে-মাঝে অবাক হ'য়ে যাই, এবং বিচক্ষণতা, যাকে আমরা বুদ্ধি, মেধা কি মনীষা বলি, তার চেয়ে ঢের বেশি দরকারি জিনিস। মন্ত্রীমহাশয়দের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম যথেষ্ট, আবার বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার বইটি সুভাষ বোসকে উৎসর্গ করেছি, গোপনে হিন্দুমহাসভাকে চাঁদা দিলেও সাম্প্রদায়িকতা আমার মধ্যে একবারেই নেই, কেননা গণ্যমান্য মুসলমান প্রায় সকলেই আমার বন্ধু। ছাত্রসমাজেও আমার প্রতিপত্তি বেশ, কেননা আমার মতামত একবারেই রক্ষণশীল নয়—এমনকি, আমি সোশ্যালিজম-এর পক্ষপাতী, যদিও রুশদেশে সেটার প্রয়োগ যেভাবে হচ্ছে সেটা আমার অ-মানুষিক মনে হয়। আমি ভেবে দেখেছি সোশ্যালিজম্ আর ফাশিজ্‌ম আসলে একই বস্তু, যদিও ছাত্রদের সভায় সে-কথা বলিনে—কেননা ওরা তো কোনো জিনিস ভালো ক'রে বুঝে ছাখে না, কেবল হুজুগে মাতে, আর চলতি হুজুগের বিপরীত কোনো কথা শুনলেই চ'টে যায়।

আমার বিশ্বাস, সব রকম দল, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় আমাকে পছন্দ করে। যদিও নিজের মুখে বলছি, তবু এ-কথা সত্য যে সকলের সঙ্গে আমার ব্যবহার খুব ভদ্র। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কারো পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হয় না। প্রার্থীদের জন্য যথাসাধ্য করি। নিজে যদিও সিগারেট খাইনে, বাড়িতে সিগারেট রাখি, এবং ছাত্ররা বাড়িতে এলে তাদের দিকেও রুপোর বাক্সটি প্রসারিত করি।

ওরা খায় না, কিন্তু খুব খুসি হয়। ছাত্রদের জন্যে খাটতে আমার আলস্য নেই; যেদিন লেক্‌চার থাকে সেদিন সকালে অন্তত দু' ঘণ্টা পড়াশুনো এখনো করি। লোকে বলে, কষ্টে যারা মানুষ হয় অবস্থা ফিরলে তারাই হয় কৃপণশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমি পয়সার মায়া ক'রে নিজেকে কিংবা আমার স্ত্রী-পুত্রকে কোনো সুখ থেকে বঞ্চিত করেছি এ-কথা কেউ বলতে পারবে না। দু'হাতে রোজগার ক'রে দু'হাতেই আমি খরচ করি—কেননা পরের জন্য খরচ করতেও আমি যে কুণ্ঠিত নই তা আমার বন্ধুবান্ধব, যারা প্রায়ই আমার বাড়িতে ভোজে নিমন্ত্রিত হয়, তারাই বলবে। তাছাড়া বারো মাসে ছত্রিশ চাঁদা তো লেগেই আছে।

যে-লোক প্রিয়কারী, তার উপর কার্যকরী, তার উপর সহজেই প্রভাবশীলদের নজর পড়ে। এই তো সেদিন কিট-ক্যাট ক্লাবের ভোজে বাংলার একজন মন্ত্রী আমার পাশে বসেছিলেন। 'কী হে, তালুকদার, মন্ত্রী-টন্ত্রী হবার সখ হয়?' কথায়-কথায় তিনি বললেন। আমি হেসে বললুম, 'আপনাদের দয়া হ'লে আজকালকার দিনে সবই সম্ভব।' তারপর তিনি দু'একটা কথা বললেন—অবশ্য পরিহাসচ্ছলে—কিন্তু ইঙ্গিতগুলো স্পষ্ট। বর্তমান ক্যাবিনেটে যদি কোনোরকম গোলমাল হয়—এবং হবারই সম্ভাবনা—তাহ'লে শিক্ষামন্ত্রীর পদটা হয়তো তার কাছেই আসবে, তিরিশ বছর আগে যে তিরিশ টাকার ইস্কুলমাষ্টার ছিলো। যাঁর কাছ টিপ্‌টা পেলুম সে-ভদ্রলোক মন্ত্রী হবার আগেই তাঁর জামাইকে আমি আমার ডিপার্টমেণ্টে লেকচারার করেছিলুম। আমার দূরদৃষ্টি আছে—এবং দূরদৃষ্টি মনীষার চাইতে মূল্যবান।

মন্ত্রীত্বের কথা না-হয় ছেড়েই দিলুম। রাজনীতি বড়ো অস্থির নদী, কথায়-কথায় সেখানে নৌকোডুবি হয়, তার মধ্যে ঝাঁপ দেবো কিনা এখনো ভেবে স্থির করতে পারিনি। বরং আসামে ইউনিভার্সিটি হ'লে

তার ভাইস-চান্স্‌লার হওয়া ভালো, সে-প্রসঙ্গেও আমার নাম উল্লিখিত হ'তে শুনেছি। তাছাড়া এলাহাবাদ আছে, অন্ধ্র আছে, ঢাকা আছে··· দু'চার বছরের মধ্যে হয়তো একটা ভাইস-চান্স্‌লার হ'য়ে যেতে পারি, কে জানে! এলাহাবাদের উপর নজর রাখা ভালো, সেখানে এখন কংগ্রেস-মন্ত্রীত্ব, আর গত বছর লক্ষ্মৌ গিয়ে জবাহরলালের সঙ্গে আমার একটানা চার ঘণ্টা কথাবার্তা হয়। ভদ্রলোকটি বেশ, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে আমার বইখানা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: দশ টাকা: এখন পর্যন্ত এ-গ্রন্থই প্রামাণ্য) প'ড়ে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। কাল গবর্নর লাঞ্চে ডেকেছেন, কায়দা ক'রে কথাটা একবার পাড়তে হবে।

তাছাড়া, এখানেই যদি শেষ হয়, এর উর্ধ্বে আমার ভাগ্যরেখা আর যদি না গিয়ে থাকে, তাহ'লেই বা ক্ষতি কী? আমার পক্ষে, আমার মতো মানুষের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে—যথেষ্ট—তারও বেশি। তলিয়ে দেখতে গেলে আমি কী? সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন বাঙালি—এই তো? কোনোদিকে বিশেষ কোনো ক্ষমতা নিয়ে আমি জন্মাই নি—নিছক পরিশ্রম ও সততার দ্বারাই জয়ী হয়েছি। জন্মেছিলুম নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, বাপ ছিলেন—ব'লেই ফেলি—বাপ ছিলেন মাদারিপুরে মোক্তার, তাঁর ইচ্ছে ছিলো—হায়রে উচ্চাশা!—আমি মাদারিপুরেই বি. এল্. পাশ-করা উকিল হই (সেকালে বি. এল্. পাশ না ক'রেও উকিল হওয়া যেতো।) ইস্কুলমাষ্টারিতেই আমার জীবন শেষ হ'তে পারতো—কি ব্যাঙ্কের, কি পোষ্টাপিসের কেরানিগিরিতে; কৃশ, ক্ষুধিত ও কাংস্যভাষী গ্রাম্য উকিল হ'তে পারতাম আমি; হতে পারতাম ব্যাকুল ও উদ্‌ভ্রান্ত বীমার দালাল—কিন্তু সে-সব কিছুই না হ'য়ে আমি হলাম ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের একজন দিকপাল! রাসবিহারী এভিনিউর উপরে আমার কম্পাউণ্ডওলা বাড়িটি অনেকেই চেনে, আজ থেকে দারজিলিং-এও আমার নিজের বাড়ি

হ'লো। এটা কেউ-কেউ লক্ষ্য করেছে যে আমার সমপদস্থ অনেকের চাইতেই আমার আর্থিক অবস্থা ভালো মনে হয়। কথাটা আমি নিজেও মানি। তবে আসলে ব্যাপারটা হয়তো এই যে অন্যদের তুলনায় আমি খরচ করি বেশি ও সঞ্চয় করি অল্প ; আর তাছাড়া একটু অবহিত হ'লে ও হাতে কিছু থাকলে টাকা আজকালকার দিনে সহজেই বাড়ানো যায়—ঐ রূপলাল লোকটাই কি আমাকে ভালো-ভালো শেয়ারের খোঁজ কম দিয়েছে।

সুতরাং আমি যদি মনে-প্রাণে সুখী না হই, তাহ'লে ভাগ্যের প্রতি নেহাৎ নেমকহারামি হয়। আমার ধারণা, যে যতটা যোগ্য, জীবনে সে ততটাই পায় ; কিন্তু এ-ধারণা সত্য হ'লেও আমি আমার দুর্ভাগা জন্ম ও বাল্যের প্রতিকূল পরিবেষ সত্ত্বেও যে এতটা যোগ্য হ'তে পেরেছি, তার মধ্যে অদৃষ্টের খানিকটা হাত মানতেই হয়। আমার বাল্যের ও যৌবনের সঙ্গী ও সমকক্ষরা আজ অকৃতী, অজ্ঞাত, দরিদ্র, নামহীন জনগণের মধ্যে নিশ্চিহ্ন। তাদের মধ্যে আমারই মতো হয়তো অনেক আছে। আমারই মতো ? কিন্তু ঠিক আমার মতো হ'লে তারাই কি আজ নিচে প'ড়ে থাকতো! নিশ্চয়ই আমার এমন-কিছু আছে যা তাদের নেই, যার জোরে আমার এই আশ্চর্য উত্থান। হয়তো অধ্যবসায়, হয়তো নিষ্ঠা, হয়তো সুবুদ্ধি···সে যা-ই হোক, তারই জোরে আমি উঠেছি, উঠেছি, ধাপে-ধাপে সমাজের সিঁড়ি বেয়ে যে-উঁচু চূড়ায় আমি আজ আসীন, আমার পুত্র-পৌত্র বিনা আয়াসেই তার চেয়েও উঁচুতে উঠে যেতে পারবে। হাজার হোক্, আমি একজন বড়োলোক চাকুরে মাত্র, কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে ও তাদের ছেলেমেয়েরা—তারা হবে বড়ো ঘর। এবং এই বড়ো ঘর আমারই সৃষ্টি।

আমার সহধর্মিণীও সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে। বি. এ. পাশ করবার

অল্প পরেই আমার বিবাহ হয়েছিলো, এবং তখনকার আমার পক্ষে ভালো স্ত্রীই হয়েছিলো। সুন্দরী, লেখাপড়া বিশেষ শেখেননি, কিন্তু সব মেয়েরই যেমন থাকে, সাধারণ বুদ্ধি প্রবল। কত যে প্রবল, তা টের পেলুম প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে এসে। সেই তিন বছরে তিনি চলনসইরকম ইংরেজি শিখে নিয়েছিলেন···তারপর কালক্রমে সাজসজ্জা, আদবকায়দা, হাব-ভাব, যখন যেমন দরকার, আশ্চর্য সহজে আয়ত্ত ক'রে নিলেন। কষ্টেস্মৃষ্টে দীনজীবন যাপন করতে হবে এই জেনেই তিনিই আমার ঘরে এসেছিলেন, কিন্তু লাটের বাড়িতে খানা খাবার ডাক এলো যেদিন, সেদিনও তিনি চমৎকার চালিয়ে নিলেন। আশ্চর্য জীব এই মেয়েরা। জন্মান্তর এদের স্বভাবগত ; পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে আসবার দ্বিজত্ব এদের রক্তেই আছে, বোধ হয় সেইজন্যেই জীবনের যে-কোনো বিরাট পরিবর্তন এরা যত সহজে মেনে নিতে ও নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, পুরুষরা ততটা পারে না। সত্যি বলতে, অতীতকে আমার স্ত্রী যে-রকম নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছেন, আমি সে-রকম পারিনি। আমার কথায় এখনো পূর্ববঙ্গীয় আভাস পাওয়া যায়, দুঃস্থ আত্মীয় সাহায্য প্রার্থনা করলে দয়াই হয়, পুরোনো ও সামাজিক হিসেবে নগণ্য কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে ভালোই লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রী, যিনি জীবনের কুড়ি বছর পর্যন্ত (অর্থাৎ আমি যতদিন ইস্কুলমাষ্টার ছিলুম) একটা সব্‌-ডিপটিকেও মহৎ ব্যক্তি ব'লে ভেবেছেন, তাঁর যোগ্য বন্ধু-বান্ধব আজ কলকাতার শহরেও খুব বেশি নেই। মেয়েরা আশ্চর্য জীব, সত্যি।

ঐ ইস্কুলমাষ্টারের ঘরেই একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মেছিলো, তারপর আর সন্তানলাভের সৌভাগ্য আমার হয়নি। পিতৃনির্বাচনই ওদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, তারপর আর ভাবতে হয়নি। ছেলে গাইনকলজিস্ট, রোটণ্ডার ডিগ্রি নিয়ে ভিয়েনা ও আমেরিকায় শিক্ষা শেষ ক'রে

ফিরেছে, ডক্টর সুহৃৎ সোমের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই প্র্যাকটিসে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। বাঙালির মধ্যে আই. সি. এস্-এর সাম্প্রতিক স্বল্পতা ও বিবাহযোগ্যা সুকন্যাদের বহুলতা সত্ত্বেও মেয়ে যে একটি বাঙালি আই. সি. এস্-কেই বিয়ে করতে পেরেছে এ-জন্য তার মাকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। জামাইটি তুখোড়, এখন পূ—গঞ্জে এস্. ডি. ও.। পুত্রকন্যা উভয়েরই ছেলেপুলে হয়েছে ও হচ্ছে; মেয়ের চিঠিপত্র প্রায়ই পাই, সুখে আছে।

এই আমি যদি মনে-প্রাণে সুখী না হই, তার চেয়ে ঘোরতর নেমক-হারামি আর কী হ'তে পারে? যা-কিছু আমি চেয়েছিলুম, সবই হয়েছে; দারজিলিংএর এই বাড়িটি পর্যন্ত। যা ছিলো আমার পক্ষে উন্মত্ত দুরাশা, তা-ও ব্যর্থ হয়নি। আমি কৃতী, এবং আমার কৃতিত্ব আমি উপভোগ করি—আমার অবস্থায় কে না করতো? আমার সহকর্মী প্রতুল চ্যাটার্জি, ইওরোপীয় ক্ল্যাসিক্স-এ সম্ভবত ভারতবর্ষের একমাত্র পণ্ডিত, প্রায়ই আমাকে বলে, 'ওহে মহিম, তোমার গা দিয়ে যে সুখ চুঁইয়ে পড়ছে, মোটা লোকের গা দিয়ে যেমন ঘাম চুঁইয়ে পড়ে।' ঠাট্টা ক'রেই বলে, কিন্তু আমি কিছুই মনে করি না, বরং খুসিই হই। কেননা ঠাট্টার পিছনে হয়তো একটু ঈর্ষা আছে, এবং ঈর্ষিত হ'তে ভালোই লাগে। প্রতুল চ্যাটার্জি পণ্ডিত লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু কে ওর নাম জানে! চাকরিটি নিয়ে মুখ বুজে পড়ে আছে, কাজে উৎসাহ নেই, কোনো উচ্চাশা নেই। কলকাতার বনেদি ঘরের ছেলে, এককালে বিষয়সম্পত্তি ভালোই ছিলো, বিয়ে করেছে ঠাকুরবাড়িতে, হয়তো এই চাকরিটাকে বিশেষ কিছু মনে করে না, মনে-মনে তুচ্ছ করে। এখন, যে-কাজে উপজীবিকা, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে কিছুতেই উন্নতি হয় না, এ আমি বার-বার দেখেছি। যার যে চাকরিই হোক্, সেটাকেই দেশের শ্রেষ্ঠ চাকরি মনে ক'রে নিতে হবে, এমনকি তাতে

পৃথিবীর যথেষ্ট উপকার হচ্ছে তাও বিশ্বাস করতে হবে, উন্নতির এই হ'লো মূলমন্ত্র।

আসলে প্রতুল আমাদের দেশের ক্ষীয়মাণ অভিজাত্যেরই প্রতিমূর্তি, বাঁচবার বায়লজিকাল তাগিদটাই ওর নেই। একজন লোকের সঙ্গে হেসে দুটো কথা বললে যদি হাজার টাকা পকেটে আসে, ও তা-ও করবে না। ধুতির দীর্ঘ কোঁচা সামলাতে-সামলাতে ধীরে-ধীরে আসে, ক্লাশটি নিয়ে চ'লে যায়, কথাবার্তা যা বলে তার মধ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপই বেশি, জগতের কোনো জিনিসই যেন ওর পক্ষে যথেষ্ট ভালো নয়। একে মুমূর্ষু ছাড়া কী বলে? ওকে দেখেই বুঝতে পারি যে আমাদের দেশের আভিজাত্যের কাল ঘনিয়ে এসেছে।

পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে সবুজ-সোনালি বিকেলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে এ-কথাগুলি ভাবতে বেশ ভালোই লাগছিলো। এমন নির্জন, নির্লিপ্ত অবসর আজকাল আমার জীবনে বড়ো একটা আসে না; এই বিকেলের আলোয় নিজের জীবনগ্রন্থের পাতাগুলি উল্‌টিয়ে গভীর তৃপ্তি পেলুম। কিন্তু খানিকক্ষণ থেকে আমার উপর অদৃষ্টের অন্যতম প্রধান আশীর্বাদ সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিলুম—সচেতন হচ্ছিলুম জঠরের গহ্বরে। কেননা যদিও আমার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি তবুও আমার যথাসময়ে বেশ ভালোরকমই খিদে পায়; আমি যতটা খাবো, এবং খেয়ে হজম করবো, আজকালকার অনেক যুবক তা পারবে না এ-কথা জোর ক'রে বলতে পারি। অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করছি যে অদ্যাবধি আমার ডিস্‌পেপসিয়া, ডায়াবেটিস বা ব্লাড-প্রেশার কোনোটাই হয়নি; রাত্রে আমি দিব্যি ঘুমোই, এবং দিনে চার বার স্বভাবিক ক্ষুধাবোধ করি। তার উপর দারজিলিং-এর হাওয়া! দেড়টার সময় বেশ ভারি লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়েছি, এর মধ্যেই শূন্যজঠর কাৎরিয়ে উঠেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এতক্ষণে সাড়ে তিনটে। উঠি এবার, আস্তে-আস্তে হোটেলে গিয়ে পৌছাতেই ওদের চা প্রস্তুত হবে। আচ্ছা, আর পাঁচ মিনিট যাক্।

একজন লোক আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'Excuse me, have you got matches?'

আমি মাথা নেড়ে অন্যদিকে তাকালুম।

লোকটি আবার বললে, 'দেশলাই আছে?'

বিরক্ত হ'য়ে লোকটার দিকে তাকালুম। বেশভূষা বড়োই জীর্ণ, ঠিক ভিখিরি না হোক, ভদ্রলোকের মতো দেখায় না। ব্রাউন ওভর-কোটটার দু'তিন জায়গায় গর্ত, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড্ কেনা মনে হয়, দীর্ঘাকৃতি লোকটির পক্ষে একটু খাটোও বটে। ট্রাউজর্স তো রীতিমতো হ্রস্ব, তার গোল সীমান্তদ্বয় বহুদিনের ধুলো-কাদায় মলিন, জুতোটা বীভৎস। গলায় একটা ভারি পশমি মফ্‌লর জড়ানো, আর মাথায়—আশ্চর্যের বিষয়—চকচকে নতুন সবুজ ফেল্টের টুপি।

আমি বেশ একটু রূঢ়ভাবেই বললুম, 'না, দেশলাই নেই।'

'দুঃখিত। তুমি যে সিগারেট খাও না তা ভুলে গিয়েছিলুম।'

বলে কী! পাগল নাকি লোকটা? অবাক হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম—তাকিয়েই চিনতে পারলুম। এর আগের বারে শুধু ওর পোষাকই লক্ষ্য করেছি, ওর মুখ ভালো ক'রে দেখিনি। এ-মুখ ভুল করবার নয়।

আন্তরিক উৎসাহের সহিতই বললুম, 'আরে, সুপ্রতিম যে।'

'চিনতে পেরেছো তাহ'লে।'

'বাঃ, চিনতে পারবো না! কিন্তু কতদিন পরে দেখা বলো তো! সেই সাতাশ সালে শিশির ভাদুড়ীর নাট্যমন্দিরে দেখা হয়েছিলো—না?

"ষোড়শী" হচ্ছিলো সেদিন। অভিনয়ের পরে ভাদুড়ীর ড্রেসিংরুমে দেখা—মনে পড়ে? বারো বছর পরে দেখলুম তোমাকে।'

আমি একটু গর্বের সঙ্গেই এ-সব খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত বললুম; তারিখ ও স্থান, মানুষের মুখ ও নাম সমস্ত বিষয়েই আমার স্মৃতিশক্তি ভালো, কখনো ভুল হয় না। কি সিণ্ডিকেটে, কি ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল-এর ডিরেক্টরদের মীটিঙে (জোর ক'রেই ওরা আমাকে ডিরেক্টর করেছে) আমাকে সকলেই সমীহ ক'রে চলে—কারণ ছোটোবড়ো যে-কোনো তথ্য দরকার হ'লেই আমি মনে করতে পারি।

'হ্যাঁ, মনে পড়ে,' একটু ক্লান্তভাবে এ-কথা ব'লে সুপ্রতিম আমার পাশে ব'সে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে আমি যে একটু স'রে বসলাম সেটা নেহাৎই রিফ্লেক্স অ্যাকশন, পর-মুহূর্তেই লজ্জিত হ'য়ে আবার একটু স'রে এলাম, কেননা সত্যি-সত্যি আমি স্নব নই। সুপ্রতিম বোধ হয় কিছুই লক্ষ্য করলে না।

বললুম, 'কী খবর তোমার? কেমন আছো?'

'সম্প্রতি বড়ো খারাপ আছি। দেশালইের অভাবে সিগারেট খেতে পারছি না।'

প্রশ্নটা না-করলেই পারতুম; কেননা আমার এই বন্ধুটি (হ্যাঁ, এই পতিত দুর্ভাগাকে বন্ধু বলতে আমার দ্বিধা তো হয়ই না, বরং গর্ব হয়) যে ভালো নেই তার ছিদ্রময় ওভরকোট আর বিবর্ণ জুতোই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুপ্রতিম যে জীবনে কিছু করতে পারবে না তা অনেক আগেই বুঝেছিলুম, কিন্তু তার এতখানি দুর্গতি কখনো দেখতে হবে তাও ভাবিনি। অথচ এমন একদিন ছিলো যখন আমাদের সকলেরই মনে হ'তো যে এই পৃথিবী সুপ্রতিম মিত্রের জয় করবার পক্ষে যথেষ্ট বড়ো নয়।

কলেজে ওর সঙ্গে চার বছর পড়েছিলুম। জিনিয়স ছাড়া ওকে আর যে কী বলা যায় তা তো জানি না। ওর সঙ্গে অন্য সকলের প্রতিভার ব্যবধান এত স্পষ্ট ছিলো যে ওর শ্রেষ্ঠতা আমরা সহজে ও সানন্দে মেনে নিয়েছিলুম। সমস্ত বিষয়েই ওর যেন স্বাধীন ও অবাধ অধিকার, অথচ ওর চাইতে ঢের বেশি পড়াশুনো অনেক ছেলেকেই করতে দেখতুম। আসল কথা, অল্প একটু জেনে বাকিটা নির্ভুল অনুমান ক'রে নেবার সৃজনীপ্রতিভা ওর ছিলো। এই ক্ষমতাই তো কবির, কথাশিল্পীর, কেননা জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে-কোনো ব্যক্তিরই অতি পরিমিত হ'তে বাধ্য, অথচ শিল্পী জগতের সমস্ত ঘটনাই নির্ভুল বর্ণনা করেন,—সেইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। আমার বরাবর মনে হয়েছে যে সুপ্রতিমের মন আসলে শিল্পীর মন। অথচ কুড়ি বছর বয়সে, কলকাতায় ব'সে, ও তিন-চারটে ইওয়োরোপীয় ভাষা শিখেছিলো, সংস্কৃত জানতো ভালো, বিজ্ঞানে দখল ছিলো, এবং যে-বিষয় মোটেই জানতো না, অর্থাৎ দর্শন, সেটা পরীক্ষা উপলক্ষ্যে পড়া হবে ব'লে তাতেই অনার্স নিয়েছিলো। ঐ শাস্ত্রটার উপর আমার কিঞ্চিৎ অনুরাগ ছিলো, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমি বিচক্ষণ, তখুনি ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে বসলুম, কেননা সুপ্রতিমের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতার কোনো কথাই ওঠে না। অনার্স-এ ও ইংরিজির—এম্. এ.-তে, ও যে-সব খাতা লিখেছিলো, পরীক্ষকরা তা প'ড়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন—তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন খাতা তাঁরা কখনো পাননি। বি. এ.-র পরে আমি তো পেছিয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু খোঁজ-খবর রাখতুম, তাছাড়া মাষ্টারি করতুম বারাসতে, প্রায়ই কলকাতায় সকলের সঙ্গে দেখাশোনা হ'তো। আর যদিও সুপ্রতিম সমস্ত বিষয়েই আমার অনেক উপরে—বোধ হয় সেইজন্যেই—ওর সঙ্গেই বেশি ক'রে মেশবার আমার ঝোঁক ছিলো, আর এ-কথাও বলবো যে আমার প্রতি ওর একটুও অবহেলা কি পিঠ-চাপড়ানোর ভাব ছিলো না—

সত্যি বলতে, সকলের সঙ্গেই ও অতি অনায়াসে মিশতো, সেটা আবার আমার পছন্দ হ'তো না।

সুপ্রতিমের প্রতি তখন আমার শ্রদ্ধা যে অসীম ছিলো, আমার তারুণ্য ও দারিদ্র্য বোধ হয় তার আংশিক হেতু। সুপ্রতিমের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো, বই কিনে ও থিয়েটর দেখে অনেক টাকা ও ব্যয় করতো, আমি মনে-মনে তাকে অপব্যয়ই বলতাম, যদিও এটা স্বীকার করবো যে ওর বৈষয়িক সচ্ছলতা ওর দীপ্ত মনীষার মতোই আমাকে আকর্ষণ করতো। তার মানে এ নয় যে আমি ওর মাথায় হাত বুলোতে সচেষ্ট ছিলাম—উচ্চাভিলাষী দরিদ্রের উগ্র আত্মসম্মানবোধ ছিলো আমার। কিন্তু নিজের আর্থিক অবস্থা ভালো করতে আমিই এতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, যে অন্যের সচ্ছলতাকেও আমি শ্রদ্ধা ও উপভোগ করতাম; পূর্ণপকেট আমার মনে হ'তো সুন্দর একটি ছবি বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতোই রূপবান। হ্যাঁ, হয়-তো আমার অনভিজ্ঞতার দরুণ সুপ্রতিমকে আমি বড্ড বেশি উঁচুতে বসিয়েছিলুম, কিন্তু এও সত্য যে আমার পরবর্তী জীবনের বহু ও বিবিধ অভিজ্ঞতাতেও ঠিক ওর মতো মানুষ আর চোখে পড়লো না। বোধ হয় কাঁচা বয়সে মনে যে-ছাপ গভীরভাবে পড়ে, সহজে তা মুছে যায় না; কিন্তু তেমনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মোহমুক্তিও তো সর্বদাই ঘটেছে। ইস্কুলে পড়বার সময় যে শিক্ষককে সর্বশক্তিমান দেবতুল্য মনে হয়, কয়েক বছর যেতেই কী তুচ্ছ, কী দারুণ অবজ্ঞেয় মনে হয় তাকে। আর প্রথম যৌবনের পূজ্যপাদদের ছাগপদ বেরিয়ে পড়তেও তো দেরি হয় না। কিন্তু এই সুপ্রতিমের কখনো ছাগলের পা বেরুলো না, ওর মধ্যে এমন-কিছু আছে যা শক্ত, স্বচ্ছ, হীরার মতো অকলুষেয়। শুধু সাংসারিক সামাজিক হিসেবে নয়, নৈতিক হিসেবেও ও আজ পতিত, তা জেনেও এ-কথা বলছি। ওর জীবনের ঘটনা সব জানিনে, কিন্তু মনে-মনে জানি যে এ-কথা সত্য,

আজ বারো বছর পরে ওর পাংলা, ডিমের ছাঁদের, ম্লান মুখ দেখে এই কথাই বুঝলাম।

আমি ধ'রে নিয়েছিলুম যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুপ্রতিম শিক্ষাক্ষেত্রের একজন মহারথী হ'য়ে উঠবে, কিন্তু দু'বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর গেলো, সে-রকম কোনো লক্ষণই দেখলুম না। প্রথমে ও দিল্লিতে এক কলেজে কিছুদিন পড়ালো, তারপর শুনলুম নৈনিতালে এক শ্বেতাঙ্গ বিদ্যাপীঠে ফরাসির টিউটর হ'য়ে গেছে, তারপর বুঝি বরিশাল না মৈমনসিং না রংপুরের কলেজে কাটলো কিছুকাল, তারপর এলো প্রেসিডেন্সি কলেজে। আমি ভাবলুম, এবারে ওর উত্থানের সুরু, অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজির প্রধান অধ্যাপকের পদ ওর মারে কে! কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনলুম, ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। আস্ত পাগল দেখছি! বলা নেই, কওয়া নেই, অকারণে এমন একটা চাকরি ছেড়ে দেয়া!

সে-সময়ে কলকাতায় ও। সঙ্গে একদিন দেখা। আমি তখন বাগেরহাটে ব'সে প্রাচীন বাংলার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায় প্রাণান্তকর ঘামছি। ও থাকতো ধরমতলার এক চারতলায়, শহরের হট্টগোলেই নাকি ওর মাথা খুলতো। গিয়ে দেখি অজস্র বইয়ের মাঝখানে একটি ইজি-চেয়ারে ব'সে পাইপ টানছে। 'কী হে, তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিলে?' 'দিলুম।' কথাটায় কোনোরকম অভিযোগ বা অহঙ্কার, দুঃখ বা রাগ ছিলো না, এটা যে কোনো অর্থেই মূঢ়ের মতো বা বীরের মতো কাজ হয়েছে, এমন কোনো ইঙ্গিতই ওর কণ্ঠস্বরে কি মুখের ভাবে নেই, যা না করলেই নয়, তা-ই করেছে, এইরকম ওর ভাব। 'কেন, ছাড়লে কেন?' 'এ আমার কাজ নয়,' খুব সহজভাবে ও বললে। আমি সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞেস করলুম, 'কী ক'রে চালাবে?' 'তা খানিকটা অসুবিধে তো হবেই।' আমি জানতুম যে ওর ছাত্রজীবনের সচ্ছলতা

আর নেই, একমাস ব'সে খাবার সংস্থান আছে কিনা সন্দেহ, তাই ওর এই সহজ হাসিখুসি ভাবটা বড়োই বিসদৃশ ঠেকলো। ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা বললে:—নৈনিতাল থাকতে ইতালিয়ান শিখেছিলো মূল দান্তে পড়বার জন্যে, এইবার সুরু করবে পড়া; আপাতত আবার সফোক্লিস পড়ছে, কীট্‌স্ এখন আর ভালো লাগে না; বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই অপাঠ্য, কিন্তু মধুসূদন আশ্চর্যরকম ভালো লিখতেন। সবার শেষে বললে, 'আমি নাটক লিখেছি, জানো, এবারে নাট্যকার আর অভিনেতা হবো।'

সত্যি-সত্যি সুপ্রতিম কয়েকমাস কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছিলো। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই, কেননা কথাবার্তা বলতো চমৎকার, আবৃত্তি করতো ভালো, এবং একটু-আধটু গাইতেও পারতো। ওর অভিনয় আমার একবার মাত্র দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো, কেননা সে-সময়টায় আমি পি. এইচ্. ডি.-র থীসিস নিয়ে মারাত্মক-রকম ব্যস্ত। গিরিশ ঘোষের কী একটা নাটকে অর্জুন করেছিলো, ভালোই করেছিলো, যদিও ওর কথা বলা, হাব-ভাব যথেষ্ট 'পৌরাণিক' হয়নি। তবে এটা আমার মনে আছে যে গিরিশ ঘোষের অতি দরিদ্র পদ্যেও ওর মুখে কবিতার আবেগময় কল্লোল এসেছিলো। অভিনেতা ও হয়তো ভালোই হ'তো, কিন্তু শুনতে পাই ওর লেখা নাটক থিয়েটরের ম্যানেজার নেয়নি, এবং সেই সূত্রে ঝগড়া ক'রে ও ওর নব-লব্ধ পেশা পরিত্যাগ করে।

তাহ'লেও থিয়েটরের সঙ্গে ও একেবারে সম্পর্কচ্যুত বোধ হয় হয়নি; এবং শিশির ভাদুড়ী প্রথম যখন নাট্যমন্দির গঠন করলেন, ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলো ব'লে শুনেছি। বাংলা থিয়েটরের সঙ্গে যে-সব অপবাদ জড়িত, সেগুলো সুপ্রতিম এড়াতে পারলে না,

এবং ক্রমশ ওর জীবনযাপনের প্রণালী উচ্ছৃঙ্খল ও নিম্নগামী হ'তে লাগলো। কিছুকালের মধ্যে এমন হ'লো যে কলকাতায় ওর দেখা পাওয়া শক্ত, কখন কোথায় থাকে কেউ জানে না; কেউ বলে কালিঘাটে একটা খোলার ঘরে থাকে, কেউ বা তার চেয়েও খারাপ কথা বলে। ও যাকে একবারে 'অসুবিধে' বলেছিলো তা যে এখন ওর বিশেষভাবেই হচ্ছে, তা অনুমান করা অবশ্য শক্ত নয়; কী ওর আয়, এবং তার পথই বা কী, আমি তো তা-কল্পনাও করতে পারতুম না। তবে ওর সঙ্গে দেখা যখন হ'তো, কিছুই বোঝা যেতো না; ঠিক আগের মতোই আছে, মুখে-চোখে কি বেশভূষায় কিছুমাত্র মলিনতা নেই, এমনকি একটুও বয়েস বেড়েছে ব'লে মনে হ'তো না।

অবশ্য ওর সঙ্গে আমার দেখাশোনাও কদাচ হ'তো, কেননা ততদিনে আমি ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হ'য়ে এসেছি, বিলেত গেলুম কিছুদিন পরেই, এবং ফিরে এসে নিজের কাজেই লিপ্ত হ'য়ে পড়লুম। মাঝে-মাঝে ওর সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গুজব কানে আসতো, কিন্তু বিশেষ মন দেবার সময় আমার ছিলো না, তাছাড়া ওর সম্বন্ধে উৎসাহও অনেকটা ক'মে এসেছিলো। গত দশ-বারো বছর ধ'রে ও আমার জগৎ থেকে একেবারেই অন্তর্হিত, কেননা, ওর কলেজজীবনের বিজয়পর্বের পরে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, ওকে নিয়ে এখন আর কোনো আলোচনাও হয় না, যাদের ঘিরে রসালো গুজব ও কুৎসা রটানো যায় এমন ব্যক্তিও নতুন-নতুন দেখা দিয়েছেন। সমাজ-সংসার এতদিনে সুপ্রতিম মিত্রকে ভুলে গিয়েছে, আমিও ওকে ভুলে গিয়েছিলুম।

এই সুপ্রতিম মিত্র, সমসাময়িকদের মধ্যে যার শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দেহ, ভাষাবিদ্, পণ্ডিত ও শিল্পী, বিরল প্রতিভার অধিকারী, সে কিনা আজ একটা ফিরিঙ্গি ভিখিরির মতো দারজিলিং-এর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোকের কথায় কোনোদিনই কান দিইনি—লোকে কী না বলে! হয়তো ও কোনো-কোনো বিষয়ে একটু বাড়াবাড়িই করেছে, কিন্তু তাই ব'লে ওর এতখানি অধঃপতন কোনোদিন দেখতে হবে তা ভাবিনি। ওর এত সব মূল্যবান গুণ—তার পরিণাম কিনা এই! অধ্যাপক হিসেবে ও অসাধারণ প্রভাবশালী হ'তে পারতো, হ'তে পারতো প্রথম শ্রেণীর লেখক, বিদ্যানুশীলনের একটা উদাহরণস্থল হ'তে পারতো—কিন্তু হ'লো—কিছুই না, কিছুই না। ওকে দেখে এ-কথা না-ভেবে উপায় থাকে না যে সমস্ত গুণ কি শক্তির চাইতে চরিত্রই মূল্যবান। কোনো সঙ্কীর্ণ, লৌকিক অর্থে চরিত্র বলছি না—এ সব বিষয়ে আমার মতামত সংস্কারমুক্ত ও উদার—স্ত্রী-সংসর্গে বা সুরাপানে যে 'চরিত্র' নষ্ট হয়, তার কথা নয়; কিন্তু একটা-কিছু নিশ্চয়ই আছে যার অভাবে সমস্ত সহজাত গুণ ও অর্জিত বিদ্যা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেটা আর কিছুই নয়, সেটা স্বকর্মে অবিচল নিষ্ঠা ও সততা, বিশেষ-কোনো উদ্দেশ্যের দিকে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হবার ক্ষমতা—চরিত্র বলতে আমি এই বুঝি। এর অভাবেই সুপ্রতিমের আজ এ-দশা। কেননা এর অভাবে কোনো মহৎ ফল লভ্য হয় না—না পাণ্ডিত্যে না শিল্পকলায় না ব্যবসায়। পয়সা করতে হ'লেও এই চরিত্রবল দরকার।

২

আমি বললুম, 'একটু হাঁটলেই একটা দেশলাই কিনতে পাবে বোধ করি। উঠবে নাকি?'

'বেশ তো আছি এখানে', অলসভাবে বললে সুপ্রতিম। ঢিলে শরীরে বেঞ্চির পিছনে হেলান দিয়ে লম্বা পা দুটো বাড়িয়ে দিলে ঘাসের মধ্যে। ওর

জুতো দুটো নিষ্করুণ স্পষ্টতায় আমার দৃষ্টিকে যেন খোঁচাতে লাগলো। নিজের অজ্ঞাতেই আমার বিলিতি পেটেণ্টে মোড়া পা দুটো বেঞ্চির তলায় লুকোলো।

'আজ বেশ শীত—না ?' ব'লে সুপ্রতিম ঈষৎ যেন শিউরে উঠলো। রোদে-ধোয়া কনকনে বিকেলটি আমার ভারি ভালো লাগছিলো সে-কথা আগেই বলেছি, কিন্তু আমি কোনো মন্তব্য করলুম না। আমি মূঢ় কি অভদ্র নই ; শীত ব্যাপারটা যে আচ্ছাদন অনুসারে আপেক্ষিক আমি তা জানি। ওর ওভরকোটটা নেহাৎ বাজে কাপড়েরই হবে বোধ হয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে সুপ্রতিম আবার বললে, 'এই রোদ্দুরটা বেশ।' তারপর হঠাৎ, যেন এ-দুটো কথায় কোনোরকম সংশ্রব আছে, বললে, 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ও-বইটা না-লিখলেই পারতে।'

আমি হেসে বললুম, 'তোমার পড়বার জন্যে তো ও-বই নয়।'

'যার উপর নিজেরই শ্রদ্ধা নেই তা লিখতে পারো কেমন ক'রে ?'

আমি জবাব দিলুম, 'পাঠকরাই লেখক সৃষ্টি করে। যে-দেশে বেশির ভাগ পাঠকই নিকৃষ্ট, সে দেশে...

সরু, তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'নিকৃষ্ট লেখক হ'য়েই তুমি তাহ'লে খুসি ?'

আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, 'লেখক আমি কোনোশ্রেণীরই নই। মাষ্টারি করি, আর মাঝে-মাঝে···উঠবে নাকি এখন ? চলো, চা খাওয়া যাক্ কোথাও গিয়ে।'

আমি উঠে দাঁড়ালুম। যখন কোনো বিষয়ে মন স্থির করি, সময় নষ্ট করা আমার ধাতে নেই।

ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো।—'একটু আস্তে হাঁটো, মহিম। এত তাড়া-হুড়ো কিসের ?'

গতি শ্লথ ক'রে বললুম, 'সুপ্রতিম, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? কিছু মনে করবে না ?'

'আমি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় এ-দুর্দশায় উপনীত হয়েছি, অন্য-কেউ এ-জন্যে দায়ী নয়,' গম্ভীরস্বরে এ-কথা বললে, তারপর হেসে উঠলো। মোটেও তিক্ত নয় সে-হাসি, বিদ্রূপে বক্র নয়; সরল ফুর্তিরই হাসি, যেন বিকেলের জানলা থেকে দেখা সবুজ মাঠের মধ্যে দাঁড়ানো কোনো কিশোরী মেয়ের হঠাৎ হেসে ওঠা।

'ভালো করোনি।'

'এ না হ'য়ে উপায় ছিলো না।'

'তুমি কি তাহ'লে অদৃষ্ট মানো ?'

'এটা অদৃষ্ট একেবারেই নয়। আমি প্রথম থেকেই সমস্তটা দেখতে পেয়েছিলাম। যে-রকম ভেবেছিলাম সে-রকমই সব ঘটেছে। অপ্রত্যাশিত কিছুই নয়।'

কথাটা ভালো ক'রে বোঝবার জন্যে ওর মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু ওর মুখ নামানো, হাত দুটো পিছনে একত্র করা, পিঠ একটু বাঁকানো। রাস্তাটা এখানে খুব আস্তে উঠে গেছে, এতে কোনো সুস্থ লোকের কষ্ট হওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, একটু জোরেই পড়ছে ওর নিঃশ্বাস। ওর কি কোনো অসুখ ? ও কি মুমূর্ষু—রিক্ত, নিঃসঙ্গ আর মুমূর্ষু ?

চৌরাস্তার সমতলে এসে একটু দাঁড়ালো। চুপ ক'রে রইলো একটু, যতক্ষণ না স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ফিরে এলো। তারপর চোখ তুলে তাকাতেই হলদে একটি রোদের রেখা ওর কুঞ্চিত কপালে এসে পড়লো, আর ওর চোখ উঠলো ঝকঝক ক'রে, যেন চোখের পিছনে লুকানো কোনো আলো হঠাৎ জ্ব'লে উঠেছে। সে-দীপ্তি নিষ্ঠুর, জীবনের সবুজ আবরণ ছিঁড়ে গিয়ে যেন শ্বাপদ-মৃত্যুর জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই ওর কোনো অসুখ। যক্ষ্মা ?

আমি লক্ষ্য করলুম যে এতদিনে ওর চেহারায় ওর বয়েস সহজেই ধরা পড়েছে। ওর মুখের রঙ্গমঞ্চে যে-সব সূক্ষ্ম রেখার লীলাভিনয় এখন চলেছে অনেকদিন পর্যন্ত তারা নেপথ্যেই ছিলো, এখন এই পঞ্চমাঙ্কে ওরাই জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু ও একটুও মোটা হয়নি, বরং আগের চাইতে আরো একটু রোগা যেন—পিছন থেকে দেখলে হঠাৎ তরুণ ব'লে ভুল হ'তে পারে। আর ও যখন ঠোঁট বাঁকিয়ে মুচকি একটু হাসলো, তা যেন কোনো বালিকার হাসির মতোই অকপট ও মধুর।

হেসে বললে, 'সেদিনও অবজরভেট্রি হিল্-এ লাফিয়ে উঠতুম। শরীরটা গেছে।'

আমি সহানুভূতির সুরে বললুম, 'আমাদের বয়েসে পাহাড়ে বেশি হাঁটাহাঁটি না-করাই ভালো। চলো—চা-দেবী ডাকছেন—ভারি ভালো লাগছে আজ তোমার দেখা পেয়ে।'

৩

প্লিভাতে জানলার ধারে একটি টেবিল নিয়ে বসলুম। সুপ্রতিম ওর সবুজ টুপিটা খুলে ফেলতে একটু চমকে উঠলুম: ওর চুলগুলো বেশির ভাগই শাদা, আমার চুলের চাইতে ঢের বেশি শাদা। কিন্তু ডিমের ছাঁদের, পাৎলা সেই মুখ তার প্রাক্তন লাবণ্য অনেকটা বাঁচিয়ে রেখেছে।

'কিছু মনে কোরো না, ওভরকোটটা প'রেই থাকি।' গলার স্বর নামিয়ে বললে, 'আসল কথা, ওর নিচে আর কোনো কোট নেই।'

এ-রকম সন্দেহ আগেই করেছিলুম; কথা না-ব'লে টেব্‌ল্‌ক্লথটার উপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগলুম।

সুপ্রতিম চেয়ারে হেলান দিয়ে বললে, 'তুমি কিন্তু বেশি বুড়ো হওনি হে। গুপ্ত মন্ত্রটা কী বলো তো? নো স্মোকিং? হ্যাঁ, ঠিক কথা—'

ইসারায় একজন পরিচারককে ডেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে এতক্ষণে ধরালো বাঞ্ছিত সিগারেট। ধোঁয়া উঠলো পেঁচিয়ে ওর ধোঁয়ার রঙের অগোছাল চুল জড়িয়ে; মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো ওর মুখ যেন রূপান্তরিত, যেন হাড়-মাংসের চাইতে স্বচ্ছ ও সাবলীল কোনো বস্তু দিয়ে ও-মুখ তৈরি। উজ্জ্বল ই. পি. এন্. এস্.-এর পাত্র থেকে অনিন্দ্য চীনেমাটির বাটিতে চা ঢালতেই একটি মনোহর সৌরভ আমাকে অভিবাদন করলো। এদের চা-টা ভালো।

তারপর চায়ের বাটি সামনে নিয়ে দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ। জানলার পরদা সরানো, ঝকঝকে কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো দিক্‌প্রহরীর মতো কাঞ্চনজংঘার উজ্জ্বল উদ্ধত চূড়া; তারপর আমরা তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই বিকেলের হলদে-সবুজ আভা মুছে গেলো; কোঁকড়া মেঘ, ধূসর-নীল, তুষার আড়াল ক'রে নামলো নীল যবনিকার মতো, আর একটু পরেই কুয়াশার সর্বব্যাপী অস্থিহীন শরীর শুষে নিলো বন্ধুর পৃথিবীর শ্যামল-স্বর্ণিল প্রদর্শনী।

সুপ্রতিম বললে, 'হঠাৎ কী ঘন কুয়াশা! হয়তো এ কোনো দেবতারই কারসাজি, পৃথিবীর চোখ থেকে তাঁর উদ্দাম প্রণয়লীলা গোপন করবার জন্যেই এই কুয়াশা রচনা করলেন। পরাশর আর সত্যবতী।'

আমি বললুম, 'তুমি কিছু খাচ্ছো না যে?'

'খাচ্ছি।' একখানা স্যাণ্ড্‌উইচ তুলে মুখে দিলো, তারপর চার-পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে শুধু খেলো, আমিও অবশ্য তাতে যোগ দিলুম। সুপ্রতিমের

খাওয়ার ধরণটা দ্রুত, যথেষ্ট চিবোবার অপেক্ষা রাখে না, যদিও ওর দাঁতগুলো দেখলুম চমৎকার রয়েছে। আধ পেয়ালা চা জলের মতো এক চুমুকে খেয়ে ওভারকোটের পকেট থেকে মস্ত সিল্কের রুমাল বার ক'রে মুখ মুছলো, তারপর আর-এক পেয়ালা চা ঢেলে নিলে।

আগেকার কথার জের টেনে বললে, 'সেকালের মুনিঋষিরাও প্রেমিক-পুরুষ কম ছিলেন না—রাজা-রাজড়াদের কথা ছেড়েই দিলুম। প্রাচীনরা রিয়ালিস্ট ছিলেন বটে।'

'—যদিও আধুনিক রুচির পক্ষে একটু—একটু—পিচ্ছিল।'

সুপ্রতিম বললে, 'আমাদের কাছে যেটা অশ্লীল লাগে সেটা ওদের উগ্র পুত্রাকাঙ্ক্ষা। শূকরের মতো বংশবৃদ্ধি। কিন্তু প্রিমিটিভ সমাজে এ-রকম না হ'য়ে উপায় নেই।'

সুন্দর বিকেলটিকে ধূসর শীত-সন্ধ্যা তার স্পঞ্জের মতো থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে নিঃশেষে শুষে নিলে। বোয় এসে টেনে দিয়ে গেলো ভারি নীল পরদা, ইলেকট্রিক আলো জ্ব'লে উঠলো।

সুপ্রতিম বললে, 'দৃষ্টিভঙ্গিটা সুস্থ, যা-ই বলো। ন্যাকামিহীন। কিন্তু আধুনিক মানুষের পক্ষে অচল। যন্ত্রের যুগে পশু ও পুত্রসংখ্যা গৌণ। স্ত্রীলোককেও তাই এখন আমরা অন্য চোখে দেখি। এটাই যে সভ্যতা তার একটা প্রমাণ ফাশিস্টরা এর উচ্ছেদ করতে উঠে-প'ড়ে লেগেছে।'

আমি হেসে উঠলুম।

সুপ্রতিম বললে, 'তুমি কি প্রগতিতে বিশ্বাস করো?'

'সে আবার কী?'

'মানে—তোমার মতে মানবজাতি এগোচ্ছে, না পেছোচ্ছে, না কি একটা স্থির কেন্দ্র ঘিরে অবিশ্রান্ত ঘুরছে?'

'আপাতত তো মনে হয় এগোচ্ছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আর কতটুকু!'

সুপ্রতিম বললে : 'অনন্তকালের কথা ভেবে লাভ নেই, ইতিহাসের সময়ের মধ্যেই দৃষ্টিকে আবদ্ধ করা ভালো। ছাখো, আমাদের এই আধুনিক যুগ একটা ভারি অদ্ভুত জিনিস সৃষ্টি করেছে—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা নতুন রকমের সম্পর্ক।'

'সেটা কী ?' এক খণ্ড কেক চিবোতে-চিবোতে আমি জিজ্ঞেস করলুম।

'প্রাচীনদের চোখে প্রেম ও কাম অভিন্ন ছিলো—এটাকে খানিকটা পেগান মনোভাব বলা যায়—মধ্যযুগের ধার্মিকরা এ দুটোকে সম্পূর্ণ আলাদা, এমনকি বিপরীত মনে করতেন—যে-জন্য দেখবে সে-যুগের প্রেমের কবিতা সবই পরস্ত্রীকে নিয়ে—আধুনিক যুগেই এ দুটো আবার এক হ'লো, কিন্তু ঢের ব্যাপক ও গভীরভাবে। এই তো প্রগতির একটা উদাহরণ।'

প্রগতির এই প্রমাণ আমার নিজের বিশেষ গ্রাহ্য মনে হ'লো না ; বললুম, 'যা-ই, বলো, বৈষ্ণব কবিরা বুদ্ধিমান ছিলেন। পরকীয়া প্রেমই শ্রেষ্ঠ, কেননা তাতে মোহভঙ্গ হবার আশঙ্কা নেই।'

'মধ্যযুগের কথা এটাই বটে, কেননা বিবাহে তখন প্রেমের স্থান ছিলো না, কুল শীল সম্পত্তিই ছিলো বিবাহের ভিত্তি—এখনও অবশ্য মোটের উপর তা-ই আছে, কিন্তু সম্পত্তির শাসন সে-সময়ে ঢের বেশি কঠিন ছিলো—মুক্ত ইচ্ছার বিবাহ, অন্তত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, প্রায় হ'তোই না। সেই জন্যেই, যাকে কখনো পাওয়া যাবে না, তাকে ঘিরেই চলতো কল্পনার উদ্দাম লীলা। আধুনিক যুগে আমরা সে-শৃঙ্খল ভাঙবার চেষ্টা করছি—ভেঙেওছি খানিকটা—যদিও সম্পূর্ণ মুক্ত প্রেম আরো দূরের কথা। যার সঙ্গে প্রতিদিন ঘুমুচ্ছি তার মধ্যেই অফুরন্ত মোহ, এমন দুঃসাহসী কথা আধুনিক মানুষই বললে। স্ত্রীর উপর তার দাবিও এইজন্যে সর্বগ্রাসী। এ-কথাটা আমরা স্ত্রীকে কখনো বোঝাতে পারিনি।'

'তোমার স্ত্রী!'

চায়ের পেয়ালায় নাক ডুবিয়ে সুপ্রতিম আমার দিকে তাকালো।—'বাঃ! তুমি কি ভেবেছিলে আমি কখনো বিয়ে করিনি?'

'আমি ভেবেছিলাম—আমার ধারণা ছিলো—আমি জানতাম না—' তিনবার চেষ্টা ক'রে থেমে গেলাম।

'কারো জানবার কথাও নয় অবশ্যি, খুব চুপচাপ বিয়ে হয়েছিলো। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে প্রাণপণে ধূমপান করছি, আর রোজ একটা নতুন নাটকের খসড়া করছি। এমন সময় ইলা আমাকে খবর পাঠালো—"হয় আমাকে এক্ষুনি বিয়ে করো, নয় তো আমি বুবুল চাটুয্যেকেই—" '

'ইলা কে?'

'ছিলো এক ইলা। বাপ সরকারি স্বর্গের অন্যতম কেষ্ট-বিষ্টু। এই দারজিলিং-এই প্রথম আলাপ। একদিন ভোরবেলা এসেছিলুম দু'জনে অবজরভেটরি হিল্-এ। বাজি রেখে পাহাড়ে চড়েছিলুম। গেলো সে মিলিয়ে বনের মধ্যে সবুজ হাওয়ার মতো। নতুন পাতা ভরা গাছ যেন পাখা পেয়েছে, সবুজ শাড়ি-পরা তার শরীর। আমি রুদ্ধশ্বাস, কেননা আমার ঘাড়ে তার কোট, ব্যাগ ও ছাতার হ্যাণ্ডিক্যাপ চাপানো।

'উঠলুম উপরে। ঐ পাহাড়ে তখন একটি প্রাণীও আর নেই। উত্তর-জোড়া তুষার-দেবতার জলন্ত নগ্নতা। সেই পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষারের দিকে তাকিয়ে বললে, "বাজিতে জিৎলুম, এখন প্রতিজ্ঞারক্ষা করো।" '

আমি বললুম, 'তখনই কেন ওকে বিয়ে করলে না?'

সুপ্রতিম বললে, 'হ্যাঁ, আমি ওকে বেশ তীব্রভাবেই আকর্ষণ করেছিলুম। তার কারণ বোধ হয় শুধু এই যে ওর সমাজে আমার মতো মানুষ একজনও গ্যাখেনি।'

'আর তুমি?'

'আমি ? আমি ওর শরীরের লাবণ্যে মজেছিলুম। প্রেমে পড়েছিলুম সন্দেহ নেই, কিন্তু খুব বেশি ভালো লাগতো না ওকে। অবশ্য সে-বিরোধ ব্যক্তিগত নয়, শ্রেণীগত। কাজেই দিন যেমন কাটে, কাটতে লাগলো। এখানে-ওখানে ঘুরলুম। আবিষ্কার করলুম, শিক্ষকতা আমার কাজ নয়। আরো একটা আবিষ্কার করলুম—সেটা এই যে আমি লিখতে পারি।'

'কিন্তু তোমার কোনো বই কি বেরিয়েছে?'

মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে একটু অসহিষ্ণুভাবে বললে, 'না, বেরোয়নি। ওহে, তোমার টী-পটে আর চা নেই।'

'আরো দিতে বলি।'

'চা? বরং একটু শেরি খাওয়া যাক্।'

ওর জন্যে শেরি আর আমার নিজের জন্যে চা দিতে বললুম। বাইরে জোরালো হাওয়া উঠেছে, কাচের ভিতর দিয়েও তার গোঙানি শুনতে পাচ্ছিলুম। কুয়াশা কেটে একটু পরেই আকাশে তারা ফুটবে।

৪

শেরির গেলাশে চুমুক দিয়ে সুপ্রতিম বললে, 'তারপর একদিন ইলা সশরীরে আমার সেই ধরমতলার চারতলায় এসে উপস্থিত। আমি বললুম, "এ কী কাণ্ড! তোমার কি মাথা-খারাপ হ'লো?" ইলা বললে, "তোমার উপেক্ষা অনেক সহ্য করেছি, আজ এলুম বোঝাপড়া করতে।" আমি বললুম, "প্রত্যেক বাঙালি ভদ্রলোকের যা থাকে, আমার তা নেই, আর কোনোদিন হবেও না।" "কী সেটা?" "চাকরি।" ইলা হাসলো—"ওঃ!" "হাসির কথা নয়, আমার একেবারেই টাকাকড়ি নেই।"

"আছে বইকি, আমার সব টাকা কি তোমার নয়?" (ওর বাবা ওর নামে কুড়ি হাজার টাকা লিখে দিয়েছিলেন।) আমি বললুম, "কিন্তু তোমার বাবা?" ইলা একটা ইংরিজি শপথ-বাক্য উচ্চারণ করলে। বুঝলুম, মন ওর একেবারে স্থির। মনে হয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের মোটা-সোটা চাকরিটি ছেড়েছি শুনেই আমার প্রতি ওর আকর্ষণ অবাধ্যরকম উত্তাল হ'য়ে উঠেছিলো। বোধ হয় ভেবেছিলো আমি জিনিয়সগোছের জীব; দুঃস্থ, ও সম্ভবত ভ্রান্ত, প্রতিভাবানের উদ্ধারসাধনই তখন ইলা রায়ের জীবনব্রত, মহৎ হবার এত বড়ো একটা সুযোগ ও কিছুতেই ছাড়বে না।'

এখানে আমি একটা মন্তব্য করলুম, 'হয়তো ভুল বুঝেছিলে, হয়তো তিনি তোমাকে সত্যি-সত্যি—'

'হ্যাঁ, সত্যি-সত্যিই তো। প্রথম যেদিন আমাকে দেখেছিলো, সেদিন থেকেই আমাকে ভালোবেসেছিলো। আমি ওকে মুগ্ধ করেছিলুম; ও অনায়াসে ধ'রে নিয়েছিলো যে আমি এতই মহান যে আমার তুলনায় সব, সব তুচ্ছ। আমি যেন ওরই আবিষ্কার, আর সুযোগ ও সময় পেলে ও আমাকে সৃষ্টিও করবে। আমার সম্বন্ধে ওর গর্ব ছিলো অফুরন্ত।'

সুপ্রতিম ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো।

'রাঁচিতে আমাদের বিয়ে হ'লো, দু'জন বন্ধু সাক্ষী হলেন। তারপর মোরাবাদি পাহাড়ের তলায়, নীল উপত্যকার গহ্বরে, লাল টালির ছাদের একটি কুটিরে কাটলো আমাদের তিন মাস। তখন বর্ষা। চারদিকের আঁকাবাঁকা নীল পাহাড় ঝাপসা ক'রে দিয়ে ঝেঁকে-ঝেঁকে বৃষ্টি আসে, দুপুর-বেলায় নামে ঝমঝম, বিকেলের রোদ্দুর পৃথিবীকে হলুদ কাপড় পরিয়ে দেয়, তারপর রাত্রি আসে তারা-ঝরা, গম্ভীর। একদিন দু'জনে পাথরে লাফিয়ে-লাফিয়ে তীব্র একটি পাহাড়ি নদী পার হচ্ছিলুম, ইলা পা পিছলে হঠাৎ

জলে প'ড়ে গেলো। তক্ষুনি আমার হৃৎপিণ্ড যেন পাথর হ'য়ে গেলো, ভাবলুম ও গেছে। আশা করিনি উদ্ধার করতে পারবো, কিন্তু পারলুম। আমার কাঁধে মাথা রেখে সেই নির্জন মাঠের মধ্যে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগলো।...অপরূপ ওর শরীর। তিনমাস ডুবে ছিলুম ওর লাবণ্যের নদীতে।

'কলকাতায় ফিরে বাসা নিলুম রডন স্ট্রিটে—বলা উচিত, ইলা নিলে, আমিও সেখানে উঠলুম। ইলা আমার নামে বেশ ভারি একটা ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট ক'রে দিয়েছিলো, টাকার দরকার হ'লে একটা কাগজের উপর সই করলেই হ'তো। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবন ওর পৈতৃক সম্পদের বেশির ভাগই আমি উড়িয়েছিলুম—ইলা রায় তার প্রতিভা-পূজার দাম দিয়েছিলো যথেষ্ট।'

সুপ্রতিম হাসলো।

'কলকাতায় এসে ইলা খুব খুসি। সগৌরবে দেখা দিলে বন্ধুমহলে, তারা-ভরা আকাশে যেন চাঁদ উঠলো। ওর আনন্দ অফুরন্ত, ওর গৌরব অন্তহীন। সাংসারিক সুখসম্ভোগ উপেক্ষা ক'রে আমার মতো প্রতিভাবান, কৃতবিদ্য দরিদ্রকে ও যে বরণ করেছে এই গর্ব ওর মনে নেশা ধরিয়ে দিলে। এমন আর কে করেছে! এখন ও আমাকে ফোটাবে, আমাকে ফলাবে, আমার সৃষ্টিকে সৃষ্টি করবে···ওর শরীর দিয়ে, ওর স্নেহ দিয়ে, ওর অর্থ দিয়ে। বন্ধুমহলে জিনিয়সটিকে উপস্থিত করলে, ফল বিশেষ সুবিধের হ'লো না। ওর সমাজের প্রতি আমার ঘৃণা ও অবজ্ঞা মেশানো মনোভাব দু'দিনেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। আর ওরাও চোখ টেপাটেপি করলে—কেউ বা দীর্ঘশ্বাস ফেললে ইলার ভবিষ্যৎ ভেবে।

'আমি ব্রিজ জানি না, টেনিস জানি না, ঘোড়দৌড়ে যাই না, পক্ষীশিকারে উৎসাহ নেই; বিভিন্ন মোটরগাড়ির আপেক্ষিক সুবিধের কথা যখন ওঠে, তখনও চুপ ক'রে থাকি। কাজেই ওরা ভেবে নিলে

আমি ঠিক মনুষ্যপদবাচ্য নই। আর আমার পক্ষে ওদের সংসর্গ তো নিছক যন্ত্রণা। একদিন—ওরা দশ-বারোজন স্ত্রী-পুরুষ ব'সে ঘোড়দৌড়ের গল্প করছে—আমি হঠাৎ উঠে একটি কথা না বলে সোজা বেরিয়ে চ'লে এলুম। আশা করলুম আমার এই ইচ্ছাকৃত অভদ্রতা কেউ মার্জনা করবে না।

'ইলা একটু হতাশই হ'লো। ভেবেছিলো, কলকাতায় বেশ জমবে, জমলো না। আমাকে বললে, "ওদের মধ্যে গিয়ে অমন ম্লান হ'য়ে থাকো কেন? তোমার তুলনায় ওরা তো সব বাঁদর।" আমি শুধু বললুম, "তবে তো বোঝোই।" তারপর বললুম, "ও-সব আড্ডায় আর আমাকে দেখবে না কখনো, আর ওরা কেউ এ-বাড়িতে এলে তুমিই দেখা কোরো।" ইলা চুপ ক'রে মেনে নিলে কথাটা, কিন্তু মনে-মনে দুঃখিত হ'লো।

'কিন্তু সে-দুঃখ অতি ক্ষীণ। ও পূর্ণ হ'য়ে ছিলো আমাতেই। আমি যদি ওকে ও-সংসর্গ ছাড়তে বলতুম, তাও ও ছাড়তো হাসিমুখে। কিন্তু তখন আমি ও-কথা বলিনি।'

সুপ্রতিম তার শেরির গেলাস আবার ভ'রে নিলে। আমি ওর এই উপাখ্যান সাগ্রহে শুনছিলুম। আগেই বলেছি, একটা সময়ে ওর সম্বন্ধে নানারকম গুজব কানে এসেছে, কিন্তু সে-সব কথায় কান দিইনি, মন দেবার তো সময়ই ছিলো না। ও যে কোনোকালে বিয়ে করেছিলো তা পর্যন্ত আমি জানতুম না।

'তারপর?'

সুপ্রতিম বোধ হয় আমার কথাটা শুনতে পেলো না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'আমিও ওর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলুম, খানিকক্ষণ চোখের আড়াল হ'লেই ভালো লাগতো না। রডন স্ট্রিটের ছোটো ফ্ল্যাটটিতে খুব সুখেই ছিলাম। লেখকের পক্ষে আদর্শ জীবন একেবারে। বইগুলো ছিলো, ছিলো প্রচুর সময়, আর এমন স্ত্রী!

তাছাড়া যে-অর্থাভাব রক্ত শুষে নেয়, বুদ্ধিকে বিকৃত ও প্রতিভাকে পণ্য করে, তাও নেই। অর্থোপার্জনের দায় থেকে মুক্ত হ'তে পেরে আমি খুসিই হয়েছিলাম। মনে-মনে ভাবলুম, এখন যদি আমার কলম থেকে উৎকৃষ্ট লেখা না বেরোয় তাহ'লে কখনোই বেরোবে না।

'অনেক কাগজ, অনেক কালি, অসংখ্য সিগারেট খরচ ক'রে একটা নাটক লিখলুম। অ্যাপোলো থিয়েটরের কর্তার সঙ্গে আলাপ ছিলো, নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। আধ-বুড়ো মানুষ, চোখে প্যাঁসনে, ভারি হাসি-খুসি। আমার পিঠে এক চড় কষিয়ে বললেন, "চমৎকার লিখেছো, কিন্তু শেষটা বদ্‌লে দিতে হবে ভাই।" আমি তো স্তম্ভিত। শেষটা যদি বদলাবোই তাহ'লে ও-রকম লিখবো কেন? আমি বদলাতে রাজি নই শুনে ভদ্রলোকটিকে অবাক হ'তে দেখে আমি আরো বেশি অবাক হলাম। তিনি অনুনয় করলেন, বললেন, 'একটু মোড় ফিরিয়ে দিলেই নাটকটা চলবে ভালো, এতে পয়সা আছে, যদি লেগে যায় চাইকি দু'তিন হাজার টাকাও অথর্স রয়্যালটি···।' কিন্তু সদাশয় ভদ্রলোকটিকে দুঃখিত ক'রে আমি বিদায় দিলুম।

'শুনে ইলা বললে: "দাও না বদ্‌লে, একবার যদি ভালো চলে পরে তুমি যা লিখবে তা-ই ওরা নেবে, তখন ওরাই তোমার হুকুম মেনে চলবে। আমি তো প'ড়েই বলেছি, চমৎকার হয়েছে, একবার স্টেজে হ'লে কলকাতার শহরে হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে। দাও না ওরা যেমন চায় তা ই ক'রে।" আমি বললুম, "ওটা থাক্, আর একটা লিখছি।" রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে ব'লে কয়েকদিন অ্যাপোলোতে অভিনয় করলুম। কিন্তু আমার দ্বিতীয় নাটক প'ড়ে কর্তা মাথা নাড়লেন। সান্ত্বনার সুরে বললেন, "যদি একটা পৌরাণিক নাটক লেখো, কি গীতি-নাট্য···হ্যাঁ, আমাকেই দিতে হবে কিন্তু ব'লে দিলাম। তোমার মধ্যে জিনিস আছে হে।

আমাদের কথামতো চললে এতদিনে ফেমাস হ'য়ে যেতে। দেখবে নাকি আর-একবার···আচ্ছা, এসো।”

'ইলা মনে-মনে ভাবলে এটা বোকামি করলুম, যদিও মুখে বললে না। কিন্তু বৃহত্তর মূঢ়তা হ'লো একটি মাসিকপত্র বের করা। পত্রিকাটির অর্ধেক আমিই লিখতুম নানা নামে, বাকি অর্ধেকে যে-সব যুবকের লেখা থাকতো, তাঁরা আজ বিখ্যাত লেখক তো বটেই, এমনকি কেউ বা বিস্মৃত। গ্রাহক হয়েছিলো পঞ্চান্নজন, এবং ঠিক এক বছর চলেছিলো আমার এই নির্বোধ উত্তম। তারপর আর ইলার টাকা নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলায় বিবেকের সায় পেলুম না। আমার লেখা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে শুধু ঐ পত্রিকাটিতে।

'এ-সব দুর্ঘটনায় আমি সামান্তই বিচলিত হতাম। মনে আমার আনন্দের অন্ত ছিলো না। আমার কাজ আমি পেয়েছি, আমার জীবন আমি পেয়েছি। রাজার মতো ছিলুম। মানুষ যখন নিজের প্রকৃত কাজটি পেয়ে যায়, তখনই সে রাজা। সেই কাজই তার রাজত্ব। লেখা, পড়া, দু'একজন মনের মতো বন্ধু, মাঝে-মাঝে কলকাতার বাইরে বেড়ানো··· আর-কিছু আমার কাম্য ছিলো না। সাধারণ সাময়িক পত্রে লেখা প্রকাশ করবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করতুম না, কিন্তু দু'একটি বই বার করবার আয়োজন করছিলুম। সত্যি বলছি, আমার লেখা দিন-দিনই ভালো হচ্ছিলো।'

সুপ্রতিম হাসলো। ইলেকট্রিক আলোয় ঝকঝক ক'রে উঠলো তার সুন্দর, সুরক্ষিত দাঁত। কথা বলতে-বলতে প্রায়ই সে আঙুল চালিয়ে দিচ্ছিলো তার দীর্ঘ, ধূসর চুলের মধ্যে; আর তার মাথা-ঝাঁকুনির সঙ্গে-সঙ্গে চুলগুলো দুলে উঠছিলো বাতাসে-কেঁপে-ওঠা কোনো জীর্ণ গাছের শুকনো পাতার মতো।

'হ্যাঁ, আমি বেশ ভালোই ছিলুম; কিন্তু ইলার নৈরাশ্য লক্ষ্য ক'রে মাঝে-মাঝে আমার মন খারাপ লাগতো। তার জিনিয়স তাকে হতাশ করেছে। তার কোনো সন্দেহ ছিলো না যে তার স্বামী হবে কীর্তিমান, হবে জয়ী, হবে সকলের বরেণ্য; স্বামীর অদম্য উর্ধ্বগতি ফেলে আসবে কত, কত নিচে তার নিজের শ্রেণী ও সমাজ। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এখনো—অথচ সবই হ'তে পারতো। তাকে ভারি ভাবিত দেখতাম এক-এক সময়ে।

'একদিনের কথা শোনো। আবার এসেছি দারজিলিং-এ, আবার দু'জনেই দাঁড়িয়েছি অবজরভেটরি হিল্-এ ভোরবেলা। স্বচ্ছ আলোয় কাঞ্চনজংঘার পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষার যেন অনেক কাছে স'রে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে বললুম, "আমি বাজিতে হেরে গেলুম, এবার তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো।" আমার হাতের উপর গাঢ় চাপ দিয়ে বললে, "এই নাও আমার প্রতিশ্রুতি।" আমি বললুম, "এবার কলকাতায় গিয়ে বরং একটা চাকরির চেষ্টা করি—এখনো হয়তো সময় আছে।" "পাগল! তুমি কেন চাকরি করবে!" তারপর বললে, "তুমি কত বড়ো তা কি আমি জানি না! কিন্তু কেন তুমি প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছো—তোমার এ দীন ছদ্মবেশ আমি তো সইতে পারি না! মহান হও তুমি, দেখা দাও তোমার নিজের জ্যোতির্ময় রূপে—ওরা চেয়ে দেখুক।" আমি মুখ ফিরিয়ে বললুম, "শেষের কথাটা ভালো বললে না।"

'কলকাতায় ফিরে নিজেকে একেবারেই বন্দী করলুম ঘরের মধ্যে। এত কঠোর পরিশ্রম জীবনে কখনো করিনি। ইলা খুসি হ'লো—আবার হ'লোও না। আমাকে প্রায়ই এখানে-ওখানে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইতো। এ-রকম দিনযাপন স্বাস্থ্যকর নয়, ওর মতে। এ তো ইচ্ছে ক'রে জেলখানা বানানো, তাছাড়া কী। এদিকে আমি একটি লম্বা-চওড়া

উপন্যাস ফেঁদেছিলুম, তার সব ঘটনা, পাত্রপাত্রী আগুনের সহস্র শিখার মতো আমাকে চারদিক থেকে যেন ঘিরে ধরেছিলো, সেই আগ্নেয় পরিমণ্ডলে আমি আবদ্ধ।…এমনকি, সে-সময়টায় ইলাকেও যে বিশেষ লক্ষ্য করতুম তা নয়। ওর এটা ভালো লাগছে না বুঝতে পারতুম, কিন্তু ঐ জ্বলন্ত, স্পন্দমান কাজ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনা অসম্ভব ছিলো। আমি লক্ষ্য করতুম, যেখানে অনেক মেয়েরা আসে ও আমাকে সেখানেই নিয়ে যেতে চায়: ওর ইচ্ছে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমি একটু-আধটু ফ্লার্ট করি, তাহ'লেই ও আমাকে আবার ফিরে পাবে।

'কিন্তু আমি কখনো কোথায় যাইনি।

'একদিন বিকেলবেলা ইলা সাজগোজ ক'রে বেরুচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায় যাচ্ছো?" আগে কখনো এ-প্রশ্ন করিনি, ওর অবাধ স্বাধীনতাকেই আমি সুখী ছিলাম। কিন্তু সেদিন আমার মনে হচ্ছিলো ও না-বেরলেই ভালো হয়। "মীনাদের বাড়ি যাচ্ছি," ও বললে। "ও, সেই মেনিমুখো মেয়েটার বাড়ি, যে ইংরিজি অ্যাকসেণ্ট দিয়ে বাংলা বলে?" ও বললে, "তোমার তাতে কী? তোমার সঙ্গে তো কারো সম্পর্ক নেই।" "রক্ষে করো! শোনো—তোমার আজ বেরুনো হবে না।" অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকালো। "কথা দিয়েছি যে—" "ব'য়ে গেছে—আজ বাড়িতেই থাকো। আমি চাই যে তুমি থাকো।" তখন ইলা বললে, "তুমি যদি তা-ই চাও, তবে আমি স্যারা বছর বাড়ি ব'সে কাটাতে পারি, কিন্তু তুমি তো চাও না আমাকে।" "শুধু তোমাকে চাই।" ও বললে, "তুমি তো কেবল পিঠ ফিরিয়ে ব'সে লেখো, সারাদিনে একটা কথাও বলো না আমার সঙ্গে। বন্ধু-বান্ধব আছে ব'লে তবু সময় কাটে।" "কথা না-ই বললাম, তুমি না-থাকলে আমার চলে না।" "বা রে, আমার সঙ্গে একটা কথা বলবে না, তবু আমাকে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে

হবে! আমি কি তোমার দাসী নাকি?" আমি বললুম, "হ'লেই বা দাসী।"

'সেদিন ইলা গেলো না, কিন্তু তার পরে যেদিনই ও কোথাও যেতে চাইতো আমি বাধা দিতুম। ওর প্রতি আমার আমার আসক্তি কেমন যেন উন্মাদ হ'য়ে উঠলো। আমি ব'সে-ব'সে লিখবো—আর ও থাকবে। ও কাছে না-থাকলেই যেন মনের কলকব্জা বিগ্‌ড়ে যাবে, কাজ এগোবে না। আমার মনের মধ্যে যত ছায়ামূর্তি একটু-একটু ক'রে রক্তে-মাংসে ভ'রে তুলছি, ইলাই যেন তার বিস্তীর্ণ পটভূমিকা। ও স'রে গেলে সব ভেঙে পড়বে। কাজে-কাজেই আমি অন্ধ, বেপরোয়া, নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠলুম, ওর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যেন থাকতে দেবো না, আমার মধ্যে ওকে মিশিয়ে ফেলবো। উপন্যাসের মধ্যে যে একটি জীবন্ত জগৎ সৃষ্টি ক'রে চলেছিলুম, তার সচেতন শক্তিতে আমি দৃপ্ত হ'য়ে উঠেছিলুম, সত্যি নিজেকে মনে হচ্ছিলো জয়ী, রাজা। আর ইলাকে হয়তো নির্বিবেকে দাসীর মতোই ব্যবহার করতুম।

'এই সময়ে ইলা আমাকে যতখানি, ও যত শান্তভাবে, সহ্য করেছিলো, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। অত যোগ্যতা আমার মধ্যে ছিলো না নিশ্চয়ই। ও প্রাণপণে আমার মরজি মেনে চলতো, বেরুনো বন্ধ ক'রে দিলে, আমার যখন যা দরকার সব এনে দিতো হাতের কাছে। প্রথম থেকেই অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে ও আমাকে নষ্ট করেছিলো, এখন আমার হাতে মিললো তারই প্রতিদান।

'হয়তো আমিও খুব অন্যায় করিনি। আমার পক্ষে ও ছিলো সব, সব··· ওর উপর আমার দাবি তাই অফুরন্ত। কখনো, লিখতে-লিখতে কলম রেখে দিয়ে ভাবতুম, এটা শেষ হ'লেই দু'জনে যাবো সমুদ্রের ধারে, দক্ষিণের কোনো নগণ্য জনপদে, যেখানে আর-কেউ যায় না। একা, ওকে নিয়ে

একা। যথেষ্ট ক'রে ওকে যেন পাওয়াই হ'লো না এখনো। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট বাড়ি, ভৃত্যহীন, ইলাই রান্নাবান্না করবে, ওর শাদা হাত দুটির মধ্যেই জীবনের সীমান্ত।

'হয়তো স্বার্থপরের মতোই এ-সব ভাবছিলুম, সবই ঠিক আমার ইচ্ছে-মতো হবে এটা যেন ধ'রেই নিয়েছিলুম। কিন্তু ভাগ্যিস এ-সব কথা ওকে বলিনি। কেননা আমার সেই প্রসিদ্ধ উপন্যাস শেষ হবার আগেই একদিন হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলুম। বুঝতে পারলুম, এর পরেই চুরমার।'

টেবিলের উপর কনুই ও দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সুপ্রতিম বলতে লাগলো। ওর চোখ যেন কাচের মতো; তাতে দ্যুতি আছে, আভা নেই; আর ও আস্তে-আস্তে কথাগুলো বললে, যেন ঠিক কথাটি খুঁজে পাচ্ছে না।

'সংক্ষেপে বলি। কাঞ্চনকুমার টাট্‌কা বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়র। সুপুরুষ, ওস্তাদ খেলোয়াড়, ফুর্তিতে উচ্ছল। ইলার বছর দু'একের ছোটো। প্রথম ওদের কোথায় দেখা জানি না, কিন্তু একদিন দেখি আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। ইলা ব্যস্ত হ'য়ে আমাকে বললে, "এক্ষুনি বিদায় ক'রে আসছি ওকে।" বসবার ঘর থেকে দু'একবার ভেসে এলো কাঞ্চনের উচ্চহাসি। তারপর ঘন-ঘনই সে উচ্চহাসি শোনা যেতে লাগলো।

'শোনো, মহিম: ইলার তখনকার মনের অবস্থাটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তখনই পেয়েছিলুম, যদিও এমন সময়ে পেয়েছিলুম যখন আর সময় নেই। শিল্পীর যে-শক্তিতে দুই বিপরীত ও প্রতিকূল চরিত্র সমান নৈপুণ্যে ফোটে, আমি মনে করি সেই শক্তিই আমাকে সাহায্য করেছিলো। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়িয়ে আমি ওকে দেখতে পেয়েছিলুম; যেন ও আমারই উত্তপ্ত

মস্তিষ্কের ভাবমণ্ডলে ভ্রূণ হ'য়ে আছে, আমারই যত্ন ওকে কালির আঁচড়ে রক্তে-মাংসে জন্ম দেবে। মনে করো একজন মেয়ে পৃথিবীর সঙ্গে বাজি রেখেছিলো যে তার স্বামী হবে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্যতম ; সব সে দিয়েছিলো তার জন্য, তার সমগ্র স্ত্রী-সত্তা, কিছু বাকি রাখেনি। শেষ পর্যন্ত নিজের চির-পরিচিত সংসর্গও ত্যাগ করেছিলো। কিন্তু ক্রমশ তার মনে হ'তে লাগলো যে স্বামীর পক্ষে সে বাহুল্য হ'য়ে গেছে, সে যেন ঘরের কোনো আসবাব, কি কোনো প্রিয় পরিচারিকা, যার অনুপস্থিতি ক্লেশকর, কিন্তু কাছে থাকলেই যাকে অনায়াসে ভুলে' থাকা যায়। আর এ কী জীবন তার, দিনের পর দিন এই নিঃশব্দ অবরোধ, কিছু করবার নেই, কোনো দরকার নেই তাকে দিয়ে: সে না-হ'লেও নাকি চলে না, অথচ তার থাকাটাও একান্ত নিষ্ফল। অকর্মণ্য দীর্ঘ দিন—ব'সে-ব'সে ভাবতে-ভাবতে নানা কথাই মনে হয়, সেগুলো সত্য কিনা যাচাই ক'রে দেখবার শক্তি লোপ পায়। তাই একদিন সে এ-ও ভাবলে যে তার স্বামী যে আজও কীর্তিহীন তার কারণই সে, অবাধ স্বাধীনতাতেই শিল্পী ফোটে, এই যত্ন এই অপরিমিত স্নেহই বোধ হয় তাকে আড়ষ্ট ক'রে রেখেছে। কেননা যদিও তার স্বামী তখনও নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি, এবং ইলা সেজন্যে গভীর ভাবেই ব্যথিত, তবু সুপ্রতিম মিত্রের জ্যোতির্ময় স্বরূপ একদিন যে প্রকাশ পাবেই সে-বিষয়ে ওর সন্দেহ ছিলো না। "বোধ হয় আমি ভুল করেছি," মনে-মনে ও ভাবলে।

'এদিকে কাঞ্চনকুমারের উচ্ছ্বসিত কলভাষণে ও যেন শুনলো মুক্তির কল্লোল, তার ভিতর দিয়ে যেন নতুন ক'রে দেখতে পেলো জীবনের অজস্র বিচিত্রতা, রঙের ছায়া, ভঙ্গির লীলা, দিন-রাত্রির ঢেউয়ের ওঠা-পড়া, অন্তহীন। জীবনের এই ময়ূরকণ্ঠী আঁচল একদিন তো ওকে ছুঁয়েছিলো,

আজ আবার দিগন্তে ঝিলকিয়ে উঠছে। যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ইলা সেই রঙিন দিন-রাত্রির দিকে এগোতে লাগলো। গভীর মোহ নেমেছে তার মনে, নিজের উপর আর তার শাসন নেই। একদিন কাঞ্চনকে দেখলুম নীল ওভরঅল প'রে ইলার গাড়ি সারাচ্ছে—মিস্ত্রিকে এ-সব কাজ সে করতে দেবে না—ইলা দেখছে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। গাড়ির তলা থেকে কালিঝুলি মেখে উঠে এসে দরজা না-খুলে লাফিয়ে ঢুকলো গাড়ির মধ্যে, তার হাতের চাপে এঞ্জিন গোঁ-গোঁ ক'রে উঠলো। "It's all right", ব'লে মাথা ঝেঁকে অকারণেই হেসে উঠলো হো-হো ক'রে। লোকটা একটা ফুর্তির ফোয়ারা, বেঁচে আছে এই খুসিতে উপচে পড়ছে।

'মনে আছে সেদিন চৈত্র মাস। সন্ধেবেলা দক্ষিণের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে আনা কারেনিনা পড়ছি। আলো ক'মে এসেছে; উঠে ঘরে যাবো, না কি বই পড়া থামিয়ে ওখানেই ব'সে থাকবো ভাবছি, এমন সময় ইলা এসে দাঁড়ালো দরজার ধারে। অল্প আলোয় ওর মুখ দেখলুম, সঙ্গে-সঙ্গে মনে হ'লো ও কিছু বলতে চায় যা বলা সহজ নয়। চুপ ক'রে ভাবতে লাগলুম আমি কিছু বললে ওর বলা সহজ হয় কিনা, এমন সময় ও হঠাৎ কথা বলতে আরম্ভ করলো। ঐখানে, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই। ওর কণ্ঠস্বর ভোরবেলা আধো-ঘুমে শোনা পাখিদের ডাকা-ডাকির মতো। তারপর সন্ধ্যা নামলো, ওর মুখ আর দেখা যায় না; অন্ধকারই যেন কালো শাড়ি হ'য়ে ওর গা বেয়ে উঠলো। তখন মনে হ'লো ওর কথাগুলো যেন রাত্রিশেষে কালো জলের কলস্বর। কি যেন অনেক দূর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে, স্তব্ধ রাত্রির হৃদয়ে শব্দের সুরঙ্গ খুঁড়ে। ট্রেন চ'লে গেলো, ও থামলো। আমি চুপ ক'রে রইলুম।'

অনেকক্ষণ ও শেরির গেলাসে চুমুক দিতে ভুলে গিয়েছিলো; তলায়

অল্প যে-টুকু প'ড়ে ছিলো সেইটুকু পান ক'রে মস্ত সিল্কের রুমালটা আবার বার ক'রে ঠোঁট মুছলো।

আমি বললুম, 'তারপর ?'

'কোনো মুস্কিলই ছিলো না। রেজিস্ট্রি ক'রে আমাদের বিয়ে হয়েছিলো, তাছাড়া ছেলেপুলেও হয়নি, সহজে, নিঃশব্দে হ'য়ে গেলো। কোনো হৈ-চৈ হ'লো না, কাগজেও বেরুলো না খবরটা।'

'তারপর ?'

'তারপর—এই তো দেখছো। কিন্তু সে-উপন্যাসটা আমি শেষ করেছিলুম, তাছাড়াও অনেক লেখা লিখেছি। ভাবছি এবারে বইগুলো ছাপবার চেষ্টা করি। বয়েস তো হ'লো, আর শরীরটাও বিশেষ ভালো যাচ্ছে না।'

৫

বাইরে রাস্তায় কনকনে ঠাণ্ডা, তীব্র উত্তুরে হাওয়া হা-হা ক'রে ফিরছে। ওভরকোটের গলাটা তুলে দিয়ে সুপ্রতিম বললে, 'শীত।'

আমি ঘড়ির দিকে তাকালুম। ডিনারের এখনো দেরি আছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এখানে তুমি কোথায় থাকো ?

'বারো মাসের জন্যে একটা ঘর আছে আমার। খুব অল্প ভাড়ায় পেয়েছি। শরীরটা ভালো নেই, তাই এখানেই থাকি বেশির ভাগ—কলকাতার চাইতে শস্তাও পড়ে মোটের উপর।'

'চলো তোমার বাড়ি দেখে আসি।'

'বাড়ি!' সুপ্রতিম হাসলো।

যদিও সবে সন্ধে হয়েছে, রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। অক্টোবরের শেষে অনেকেই পাহাড় থেকে নেমে গেছে, তাছাড়া শীতটা আজ সত্যি বেশি। আমি বুঝতে পারছিলুম, ওভরকোটের তলায় সুপ্রতিমের শরীরটা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলুম, তাকে প্রায় দৌড় বলা চলে। এই উত্তুরে হাওয়া বইতে সুরু করলে এ ছাড়া উপায় থাকে না।

কার্ট রোড ধ'রে স্টেশন ছাড়িয়ে কাকঝরার বস্তির মধ্যে এসে পড়লুম। তাও ছাড়িয়ে গিয়ে সুপ্রতিম বললে, 'এদিকে।' সারা রাস্তা আমরা কেউ কোনো কথা বলিনি, হাঁটতেই ব্যস্ত ছিলুম।

বাঁ দিকে একটা রাস্তা এঁকে-বেঁকে উপরে উঠে গেছে, ইলেকট্রিক আলোয় তার দুটো প্যাঁচ দেখা গেলো যেন শূন্য হৃদয়ের কাৎরানি। বিষম খাড়াই রাস্তা, কোনো বাড়িঘর নেই; কিন্তু মিনিট দশেক বুক-ভাঙা আরোহণের পর গাছের আড়ালে একখানা ঘর চোখে পড়লো। সুপ্রতিম বললে, 'ভিতরে আসবে নাকি?'

'চলো।'

দরজায় ধাক্কা দিয়ে সুপ্রতিম হাঁক দিলে, 'কাঞ্চী।'

দরজা খোলবার শব্দ হ'লো; তারপর হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে যে-মেয়েটি এগিয়ে এলো তাকে আমি প্রথমে বাঙালিই ভেবেছিলুম, কিন্তু একটু পরেই পরেই বুঝলুম সে নেপালি। কিন্তু তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে অবাক হ'য়ে গেলুম—'এত দেরি করলে যে? তোমার ওষুধ খাবার সময় পেরিয়ে গেলো।'

সুপ্রতিম বললে, 'আমার সঙ্গে এক বন্ধু এসেছেন।'

মেয়েটি ঈষৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে স'রে দাঁড়ালো; সুপ্রতিম তার হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আমাকে বললে, 'এসো।' কাঞ্চীকে যেন লক্ষ্যই করলে না।

একটি মাত্র ঘর নিয়ে বাড়িটি, সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র স্নানের ঘর রান্নাঘরও আছে। ঘরের মধ্যে একটি খাট, একটি টেবিল ও চেয়ার, আর যেখানে-সেখানে ছড়ানো কতগুলো বই। আর-কিছু নেই।

টেবিলের উপর লণ্ঠন রেখে চেয়ারটি দেখিয়ে বললে, 'বোসো।' নিজে দাঁড়ালো টেবিলে হেলান দিয়ে, বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ ক'রে। বাঙালি মেয়ের মতো শাড়ি পরা মূর্তিটি চকিতে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। আমার চোখ যেন ঝলসে গেলো, এত সুন্দর।

আমি গলা নামিয়ে বললুম, 'একে কোথায় পেলে ?'

'পেয়েছিলুম পাহাড়ি রাস্তায় কুড়িয়ে। বারো বছর আগে—ও তখন ছেলেমানুষ। ওর স্বামী মারা গিয়েছিলো বসন্ত হ'য়ে, আর-কেউ ছিলো না, আমি আশ্রয় দিয়েছিলুম। বেশি ইচ্ছে ছিলো না—কিন্তু কেমন দয়া হ'লো।'

'অমন মুখ দেখলে কার না দয়া হয় !'

সুপ্রতিম ভুরু কুঁচকে বললে, 'মেয়েটা আস্ত বোকা। ওর স্বজাতীয় যুবকেরা বিয়ে করবার জন্যে কত সাধাসাধি করে—কারো কথায় কান দেবে না। আমাকে ছেড়ে নাকি যাবে না কোথাও। সেই থেকে র'য়েই গেছে। দিব্যি বাংলা শিখেছে, কিছু ইংরিজি শিখিয়ে কলকাতার সমাজে ছেড়ে দিতে পারলে এখনো জলজ্যান্ত আই. সি. এস্. পাকড়াতে পারে—কী বলো ?' সুপ্রতিম উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।

নিজের জামাইয়ের কথা ভেবে রসিকতাটা বেশি উপভোগ করতে পারলুম না। চুপ ক'রে রইলুম।

সুপ্রতিম আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি হয়তো ভাবছো আমি যা চেয়েছিলুম তা-ই পেয়েছি—স্ত্রীতে স্ত্রী, দাসীতে দাসী ?'

'সে-রকম কিছুই আমি ভাবছিলুম না।'

'ভাবলে বিশেষ ভুল করতে না। অর্থনৈতিক কারণেই এ-ব্যবস্থা। ওর জন্যে আর-একটা ঘর আবার পাবো কোথায়? দাসীর চাইতে স্ত্রী-ই শস্তা আমার পক্ষে।'

সুপ্রতিম আবার হেসে উঠলো।

আমার একবার লোভ হ'লো বলি, 'ইচ্ছে করলেই তুমি যে-কোনো উপায়ে যথেষ্ট টাকা তো রোজগার করতে পারতে, সেটা কেন করলে না?' কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো এ-প্রশ্ন বৃথা। ওর জীর্ণ ঘরের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে ও সব ছেড়েছে, কিন্তু ওর রাজত্ব ছাড়েনি; নিজেকে একদিনের জন্যেও ভাড়া খাটায়নি, রাজা হ'য়েই জীবন কাটিয়েছে—শেষ পর্যন্ত; ওর চরিত্রধর্ম থেকে মুহূর্তের জন্যেও ভ্রষ্ট হয়নি। তবে কি নির্মমরকম চরিত্রবান হবার জন্যেই ওর এই অধঃপাত?

একটু পরে মেয়েটি ছোট্ট একটা ওষুধের গেলাশ নিয়ে এসে সুপ্রতিমের কাছে দাঁড়িয়ে বললে, 'খাও।' কথা না-ব'লে সুপ্রতিম ওষুধটা খেয়ে ফেললো।—'তোমার জন্যে এ-বেলা রুটি করবো, না লুচি?'

সুপ্রতিম বললে, 'ভাত।'

'তোমার বন্ধু—ঐ ভদ্রলোক—উনি কি চা খাবেন?' আমার দিকে না-তাকিয়ে কাঞ্চী জিজ্ঞেস করলে।

'কী হে, খাবে নাকি চা?'

'না, থাক—কিছু মনে কোরো না—এখন আর চা খাবো না। উঠি এখন।'

সুপ্রতিম আমার সঙ্গে ঘরের দরজা পর্যন্ত উঠে এলো। ঐ ছোট্ট ঘরে লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় ওকে যেন দীর্ঘতর, কৃশতর দেখালো, আর ওর মুখ যেন পুরোনো মূর্তির মতো ম্লান ও স্থির। নিজের দুর্দশা প্রসঙ্গে

প্রথমে ও যে বলেছিলো, 'এ না হ'য়ে উপায় ছিলো না', তার মানে এখন বুঝতে পারলুম। ওর দারিদ্র্য নিয়ে ও লজ্জিত নয়, সে-বিষয়ে সচেতনই নয়, বলা যায়; ও জানতো যে এ-রকমই হবে, কেননা ও যে ওর কাজ পেয়ে গেছে, আর সে-রাজত্ব ও কিছুতেই ছাড়বে না।

শেষ পর্যন্ত সুপ্রতিম ওর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।

বাইরে এসে একটু দাঁড়ালুম। দরজায় সুপ্রতিম ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলুম, 'ইলার আর খবর জানো ?

'একবার দেখেছিলুম চৌরাস্তায়—অনেকদিন আগে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, আমিও একটুখানি দাঁড়ালুম, তারপর যে যার পথে। দিঘির মতো চোখ। ওর দুই ছেলে ছিলো সঙ্গে—কাঞ্চনও ছিলো, একটু দূরে। আর উত্তর-জোড়া সেই তুষাররাশিও ছিলো—ওরা চিরন্তন, কিন্তু ওরা বোবা।'

'তুমি আজকাল তাহ'লে এখানেই·

'হ্যাঁ, একরকম তা-ই।···আচ্ছা, বেশ কাটলো সময়টা তোমার সঙ্গে।'

৬

পরের দিন সকালে উঠেই পাঁচশো টাকার একখানা চেক আর এই চিঠিটি হোটেলের চাকর দিয়ে সুপ্রতিমকে পাঠিয়ে দিলুম—

'প্রিয় সুপ্রতিম,

আজই চ'লে যাচ্ছি কলকাতায়, তোমার সঙ্গে আর দেখা করবার সময় নেই। সঙ্গের এই চেকটি দয়া ক'রে গ্রহণ কোরো।

এ কিছুই নয় ; কিন্তু আমার অনুরোধ কিছু নতুন জামাকাপড় করিয়ে নিয়ো। কিছু মনে কোরো না।

কলকাতায় এলে অবশ্য দেখা কোরো। আমার ঠিকানা উপরে রইলো।

মহিম'

ভৃত্য ফিরে এলো একখানা চিঠি আর পুরোনো রং-ওঠা একটা স্যুটকেস নিয়ে। চিঠিতে সুপ্রতিম লিখেছে—

'মহিম,

তোমার টাকা রাখলুম, কেননা টাকার আমার দরকার। কিন্তু তোমাকে কিছু না-দিয়ে এটা নিতে পারি না। আমার সমস্ত লেখার পাণ্ডুলিপি এই বাক্সে আছে। আমি আর বই বার করতে পেরে উঠবো ব'লে মনে হয় না—তুমি যদি কখনো প্রকাশ করো তাহ'লে আর্থিক ক্ষতি তোমার হবে না, হয়তো লাভও হ'তে পারে।

কলকাতায় গেলে দেখা করবো নিশ্চয়ই।

সুপ্রতিম'

স্যুটকেসের ডালা তুলে দেখলুম, রাশি-রাশি কাগজ সাজানো, সুপ্রতিমের অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে ভর্তি। পাঁচশো টাকা পেয়ে এতগুলো বই দিয়ে দিলে ও! একদিন হয়তো এ থেকে হাজার-হাজার টাকা আসবে—সুপ্রতিম এ কী কাণ্ড করলে। কলকাতায় এসেই বাক্সটা ভালো ক'রে খুলে বসলুম। গোটা চারেক নাটক, দুটো বিরাট উপন্যাস, তাছাড়া অনেকগুলো ছোটো গল্প ও প্রবন্ধ। নানা কাজের ফাঁকে সময় ক'রে নিয়ে

একটা উপন্যাস আগাগোড়া প'ড়ে ফেললুম। তারিখ দেয়া ছিলো—বুঝলুম, ইলা ওকে ছেড়ে যাবার আগে এই উপন্যাসটিই লিখেছিলো। জিনিয়সের লেখা বই, সন্দেহ নেই। এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে সুপ্রতিম মিত্র অসাধারণ লেখক। কিন্তু এ-বই এখন বাংলা দেশে ছাপানো যায় না। আমি অন্তত এ-দায়িত্ব নিতে পারিনে। আপনাদের সকলকেই বলছি, যদি কেউ সাহস ক'রে ওর বইগুলো প্রকাশ করবার ভার নেন—আমি বিনামূল্যে সব পাণ্ডুলিপি দেবো; সুপ্রতিমকে দশ পর্সেণ্ট রয়্যালটি দেবেন, তাহ'লেই হবে। যিনি এ-ভার নেবেন, হয়তো একটা সোনার খনিই তিনি পেয়ে যাবেন—সাহিত্যিক ও আর্থিক উভয় অর্থেই।
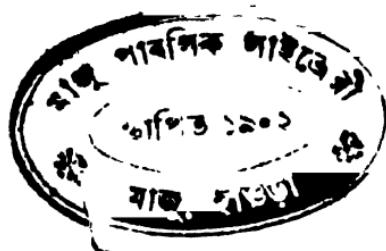
এই বইয়ের গল্পগুলি ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে লেখা। 'ফেরিওলা' 'পরিচয়ে', 'হার' ও 'সমস্যা' 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয় ও দোল সংখ্যায়, 'ওদেরই একজন' 'যুগান্তরে'র শারদীয় সংখ্যায়, 'উন্মীলন' 'অলকা'য়, 'হতাশা' ও 'সুপ্রতিম মিত্র' 'চতুরঙ্গে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই গল্পগুলির সব চরিত্রই সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোনো জীবিত ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণ এতে নেই, কি কোনো জীবিত ব্যক্তির প্রতি কোনো উল্লেখও নেই।

বু. ব.